আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী

আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী

ডঃ অতুল সুর

সাহিত্যলোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলকাতা-৬

নিবেদন

আঠারো শতক ছিল ভাঙা-গড়ার যুগ—ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ। এই শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে লেখবার অনেক কিছু আছে। কিন্তু এই বইখানি অত্যন্ত স্বল্পকায়। কারণ, এখানা 'জিজ্ঞাসা' প্রবর্তিত 'বিচিত্রবিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজের জন্য লেখা হয়েছিল। অকস্মাৎ 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন-সংস্থার প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় হৃৎপিণ্ডের দুরাধর্ষ রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, বইখানির প্রকাশ বিলম্বিত হতে পারে, এই আশঙ্কায় এর প্রকাশ 'সাহিত্যালোক'-এর কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের হাতে ন্যস্ত করি। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বইখানির মুদ্রণ সম্পূর্ণ করায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। স্বল্পকায় হলেও বইখানির মধ্যে আঠারো শতকের বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে বিনা শব্দবাহুল্যে সব কথাই বলা হয়েছে। এখন পাঠকসমাজের কাছে বইখানি সমাদৃত হলে, এই বিরাশী বৎসর বয়সে শ্রম সার্থক মনে করব।

অতুল সুর

সূচীপত্র

কথামুখ

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ও বাঙালী সম্বন্ধে অগণিত বই ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তার পূর্বগামী শতাব্দী, আঠারো শতক সম্বন্ধে আমরা এক শূন্যময় পরিস্থিতি লক্ষ্য করি। ইতিহাসের আসরে উনবিংশ শতাব্দীকে বিশেষ মর্যাদা দেবার পিছনে অবশ্য একটা যুক্তি আছে। উনবিংশ শতাব্দী ছিল একটা ঘটনাবহুল শতাব্দী, যে সকল ঘটনার ফল-সমষ্টিতে সৃষ্ট হয়েছিল বাঙলায় নবজাগরণ। তার মানে উনবিংশ শতাব্দী ছিল একটা রূপান্তরের যুগ। সেদিক থেকে আঠারো শতকও কম ঘটনাবহুল ছিল না। তা ছাড়া, আঠারো শতক অবক্ষয়ের যুগ হলেও নবজাগরণের প্রস্তুতিপর্ব আঠারো শতকের শেষের দিকেই ঘটেছিল। বস্তুতঃ বাঙলার ইতিহাসে আঠারো শতক চিহ্নিত হয়ে আছে এক সন্ধিক্ষণের যুগ হিসাবে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই শতাব্দীতে আমরা এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করি। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই শতাব্দীর গোড়াতেই ঘটেছিল দিল্লীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় মুঘল-শক্তির অবনতি। এই অবনতির অন্তরালেই বাঙলায় নবাবী আমলের সূচনা হয়েছিল, যার পদস্খলনে ইতিহাস কলঙ্কিত হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধে। এই পলাশীর যুদ্ধই বাঙলায় বপন করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বীজ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত করেছিল বাঙলার জনজীবনকে। বর্গীর হাঙ্গামার দুঃস্বপ্ন ছাড়া, পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাঙলার জনজীবন মুখরিত ছিল সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যে। এর বহিঃপ্রকাশে বাঙলার প্রাচীন সাংস্কৃতিক ধারা অব্যাহত ছিল। প্রধান প্রধান ভূম্যাধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবিজন রচনা করে যাচ্ছিলেন নানাবিধ মঙ্গলকাব্যসমূহ। আবার তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলায় নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য দেবদেউল। দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হত বটে (এখনও আবির্ভূত হয়), কিন্তু সুফলার বছরে বাঙালী অতীতের ক্লেশ ভুলে যেত। আবার দৈনন্দিন জীবন আনন্দময় হয়ে উঠত। আনন্দের স্রোতে অবগাহন করে বাঙালী বার মাসে তের পার্বণ করত। সারা বৎসর নিজেকে মাতিয়ে রাখত। এই আনন্দময় জীবন পর্যুদস্ত হয়, যখন ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দুর্বল রাজশক্তির অনুগ্রহে ইংরেজ দেওয়ানী লাভ করে। দেওয়ানী পাবার পর

ইংরেজ জনজীবনের সঙ্গতির ওপর প্রথম হস্তক্ষেপ করে। এর আগে বাঙলার ঘরে ঘরে সুতা কাটা হত, এবং সেই সুতার সাহায্যে বাঙালী তাঁতীরা বস্ত্র বয়ন করে তা বিদেশীদের বেচে প্রভূত অর্থ উপার্জন করত। দেওয়ানী পাবার মাত্র চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিরেকটররা এখানকার কর্মচারীদের লিখে পাঠাল—"বাঙলার রেশম বয়ন-শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র রেশম তৈরির ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা হউক।" শীঘ্রই অনুরূপ নীতি কার্পাসজাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হল। ইংরেজ এখান থেকে কাঁচা মাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগল, আর সেই কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বাঙলায় এনে বেচতে লাগল। বাঙলা ক্রমশ গরীব হয়ে পড়ল। বাঙলার শিল্পসমূহ জাহান্নমে গেল। বাঙালী কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ল। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে সাহেবরা নীলচাষের প্রবর্তন করল। নীলচাষ দরিদ্র কৃষকের ওপর অত্যাচারের একটা যন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। তন্তুবায়দের ভাত মারা যাবার ফলে, তন্তুবায়দের বিদ্রোহ ছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ আরও চিহ্নিত হয়ে আছে, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও চুয়াড় বিদ্রোহ দ্বারা। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর পদচিহ্নে। আর চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটেছিল বাঙলার আদিবাসীদের জীবিকার সূত্র ইংরেজগণ কর্তৃক রুদ্ধ হওয়ার ফলে। শুধুমাত্র বাঙলার অর্থনৈতিক জীবনই যে এভাবে পর্যুদস্ত হয়েছিল, তা নয়। যুগ যুগ ধরে অনুস্যূত বাঙলার ধর্মীয় জীবনের ওপরও ইংরেজ হাত দিয়েছিল। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা বাঙলায় অনুষ্ঠিত করেছিল প্রথম ব্রহ্মহত্যা। নিছক চক্রান্ত করে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখে তারা ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছিল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণসন্তান মহারাজা নন্দকুমারকে। এ সব দুর্যোগ ও দুর্গতির পরিপ্রেক্ষিতেই ঘটেছিল বাংলা হরফের সৃজন, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সার্থক রূপায়ণে সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দুই

আজ পর্যন্ত আঠারো শতক সম্বন্ধে যা কিছু বই লেখা হয়েছে, তা কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে কতকগুলো ভুঁইফোঁড় বড়লোক ও ইংরেজের বাণিজ্য ও আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস। আঠারো শতকের বাঙলার গ্রামীণ সমাজজীবন

সম্বন্ধে কিছুই লেখা হয়নি। সমগ্র বাঙলা দেশকে নিয়েই গঠিত ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের প্রত্যন্ত সুবা। তারাই এর নাম দিয়েছিল 'সুবে বাঙলা'। মুঘলরা বাঙলা সুবা তৈরি করেছিল, পাঠান শক্তির পতনের পর সম্রাট আকবরের আমলে মানসিংহ যখন বাঙলা জয় করে। মানসিংহের সমসাময়িক মুঘল রাজস্বসচিব তোদরমল্লের 'আসল-ই-জমা-তুমার' থেকে আমরা জানতে পারি যে সম্রাট আকবরের সময় সমগ্র বাঙলা দেশ ৬৮৯ মহাল-বিশিষ্ট ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। তখন বাঙলা থেকে রাজস্ব আদায় হত ৩,২৬,২৫০ টাকা। কিন্তু কালক্রমে হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, কুচবিহারের কিছু অংশ, পশ্চিম আসাম ও ত্রিপুরা বাঙলার সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় বাঙলা ১৩৫০ মহাল বা পরগণা বিশিষ্ট ৩৪টি সরকারে বিভক্ত হয় এবং রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। এই রাষ্ট্রীয় বিন্যাসই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় বলবৎ ছিল। কিন্তু মুরশিদকুলি খান যখন নবাবী আমলের উদ্বোধন করল, তখন এর পরিবর্তন ঘটল। ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত 'জমা-ই-কামিল-তুমার' অনুযায়ী বাঙলা দেশকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করা হল। তখন মহাল বা পরগণার সংখ্যা ছিল ১৬৬০ ও রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা যখন দেওয়ানী লাভ করে তখন রাজস্বের পরিমাণ স্ফীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ২,৫৬,২৪,২৩৩ টাকায়।

তিন

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বাঙলার ভূ-প্রকৃতি মোটামুটিভাবে এখনকার মতই ছিল, তবে অন্তবর্তীকালে জনবিন্যাসের অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। বাঙলার বিচিত্র ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে পশ্চিমে বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূল থেকে এক তরঙ্গায়িত মালভূমি পূর্বদিকে এগিয়ে এসেছে ভাগীরথী-স্নাত পলিমাটির দেশের দিকে। পশ্চিমের এই অংশ বনজঙ্গল পরিবৃত রুক্ষ ও কর্কশ শাশ্বত নির্জনতায় মণ্ডিত। শৈলঅন্তরীপরূপে এই মালভূমি অভিক্ষিপ্ত হয়েছে মেদিনীপুরের জঙ্গলমহল পর্যন্ত। এই অঞ্চলের শাশ্বত নির্জনতার মধ্যেই অভ্যুত্থান ঘটেছিল তন্ত্রধর্মের। অতি প্রাচীনকাল হতে এই অঞ্চলে বাস করে এসেছে অষ্ট্রিক ভাষাভাষী আদিবাসীরা যথা সাঁওতাল, লোধা, হো প্রভৃতি।

পূর্বদিকে এই ভূখণ্ডই মিশে গিয়েছে কোমল পলিমাটির দেশের দিকে।

শস্যশ্যামলা এই পলিমাটির দেশই বাঙলার ঋদ্ধির আকর। এখানেই উৎপন্ন হত ধান্য, তুলা, রেশম, ইক্ষু, সরিষা প্রভৃতি তৈলবীজ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসব কৃষিপণ্য বাঙলাদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। এ সব পণ্যই বাঙলার কৃষকের সমৃদ্ধির কারণ ছিল। পরে বাঙালীর এই কৃষি-বনিয়াদের আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল, যার পরিণামে আজ আমাদের ইক্ষু ও সরিষার জন্য বিহার ও উত্তর-প্রদেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। তুলার চাষের পরিবর্তে এখন পাটের চাষ হয়, যার ন্যায্য মূল্য বাঙালী কৃষক পায় না; কিন্তু যার মুনাফার সিংহভাগ অবাঙালীর উদর স্ফীত করে।

কৃষি ব্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রাম বাঙলার সমৃদ্ধির উৎস ছিল, নানারূপ শিল্প। অর্থনীতির দিক দিয়ে গ্রামগুলি ছিল স্বয়ম্ভর। গ্রামের লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারের সামগ্রীসমূহ ও পালপার্বণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ গ্রামের শিল্পীরাই তৈরি করত। অর্থনীতির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে গাঁটছড়া বাঁধা ছিল। সমাজ গঠিত হত ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে নিয়ে। প্রতি জাতির একটা করে কৌলিক বৃত্তি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সকল কৌলিক বৃত্তি অনুসৃত হত। তারপর উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বাঙালী তার কৌলিক বৃত্তিসমূহ হারিয়ে ফেলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কৌলিক বৃত্তিধারী জাতিসমূহের বিবরণ আমরা সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকে পাই। মোটামুটি যে সকল জাতি বাঙলাদেশে বিদ্যমান ছিল, তা সমসাময়িককালে অনুলিখিত এক মঙ্গলকাব্যে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করছি—"সদগোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি। উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি॥ যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার। নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর॥ হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি। মাজি ও বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি॥ স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার। সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার॥ ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা। পড়িল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা॥" এছাড়া, সকলের শীর্ষে ছিল ব্রাহ্মণ। এথেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল সমূহে ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রাধান্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি প্রধান জেলায় কোন্ কোন্ জাতির কোন্ কোন্ জেলায় কিরূপ প্রাধান্য ছিল, তা পরপৃষ্ঠার ছকে দেখানো হচ্ছে—

স্থান	মেদিনীপুর	হুগলি	বর্ধমান	বাঁকুড়া	বীরভূম	২৪-পরগণা	নদীয়া
প্রথম	১	১	৫	৯	২	১২	১
দ্বিতীয়	২	৫	২	৩	৫	১	৬
তৃতীয়	৩	৩	৩	৭	৩	৩	৩
চতুর্থ	৪	৬	৬	৬	৮	৫	১১
পঞ্চম	৫	২	৭	১১	৯	৬	১০

জাতি—১—কৈবর্ত ; ২—সদ্‌গোপ ; ৩—ব্রাহ্মণ ; ৪—তাঁতী ; ৫—বাগদি ; ৬—গোয়ালা ; ৭—তিলি ; ৮—ডোম ; ৯—বাউরি ; ১০—চণ্ডাল ; ১১—চামার ; ১২—পোদ ।

লক্ষণীয় যে পশ্চিমবাঙলার এই সমস্ত জেলাসমূহে সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে কায়স্থদের প্রথম পাঁচের মধ্যে কোন জেলায় প্রাধান্য ছিল না। সমগ্র পশ্চিম-বাঙলার মোট জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের স্থান ছিল ছয়। প্রথম পাঁচ ছিল যথাক্রমে কৈবর্ত, বাগদি, ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ ও গোয়ালা। আজ কিন্তু পরিস্থিতি অন্য রকম। তার কারণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'জাত কাছারী' স্থাপন করে জাতি নির্বিশেষে অনেক জাতির লোককেই 'কায়স্থ' স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। পরে অনেক জাতের লোকই সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য নিজেদের 'কায়স্থ' বলে পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। এটা নাগরিক জীবনের পরিণাম মাত্র। কেননা, নগরবাসীরা আগন্তুকের কুলশীল সম্বন্ধে কেউই কিছু জানত না। সুতরাং আগন্তুকের জাত যাচাই করবার কোন উপায় ছিল না। গ্রামের লোকেরা সকলেই সকলকে চিনত। সেজন্য সেখানে জাত ভাঁড়াবার কোন উপায় ছিল না। গ্রামের লোকেরা হয় নিজের গ্রামে, আর তা নয় তো নিকটের গ্রামেই বিবাহ করত। এই বৈবাহিকসূত্রে এক গ্রামের লোক নিকটস্থ অপর গ্রামের লোকেরও জাত জানত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রামবাঙলায় এই সকল হিন্দুজাতি ছাড়া, ছিল আদি-বাসীরা। মেদিনীপুরের আদিবাসীদের মধ্যে প্রধান আদিবাসী ছিল সাঁওতাল, লোধা ও হো। বাঁকুড়ার আদিবাসীদের মধ্যে ছিল কোরা, ভূমিজ, মাহালি, মেচ, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও ওঁরাও। সকলের চেয়ে বেশি আদিবাসী ছিল

বীরভূমে, প্রায় সবই সাঁওতাল। রাজশাহীর আদিবাসীদের সংখ্যা তুলনামূলক-ভাবে ছিল কম। এখানকার প্রধান আদিবাসী ছিল মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি। সাঁওতালদের ৭৩·৭৩ শতাংশ বাস করত মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলি জেলায়। বাকী অংশ বাস করত পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলায়। মুণ্ডারা অধিক সংখ্যায় (৬০·১৮ শতাংশ) বাস করত জলপাইগুড়ি ও চব্বিশ পরগণা জেলায়। বাকী ৩৯·৮২ শতাংশ বাস করত বাকী জেলাসমূহে। ওঁরাওদের ৮৯·০৪ শতাংশ বাস করত জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও চব্বিশ পরগণায়। সমষ্টিগতভাবে পশ্চিমবাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে ৯০·১৫ শতাংশ ছিল সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোরা ও লোধা। তবে সাঁওতালরাই ছিল বাঙলার আদিম অধিবাসী। কিংবদন্তী অনুযায়ী তাদের জন্মস্থান ছিল মেদিনীপুরের সাঁওত পরগণায়।

এ ছাড়া ছিল ধর্মান্তরিত মুসলমান সমাজ। তাদের কথা আমরা এখানে বলছি না।

চার

আগেই বলেছি যে আঠারো শতকের গোড়ায় বাঙলাদেশের বিরাট আকার ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ওড়িশা, আসাম, ও কুচবিহারের অংশবিশেষ ও ত্রিপুরা। এটা বিভক্ত ছিল ১৬৬০ মহাল বা পরগণায়। সব মহল অবশ্য সমান আকারের ছিল না। কোন কোনটা খুব বড়, যার বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টাকা। আবার কোন কোনটা খুবই ছোট, এত ছোট যে রাজদরবারে দেয় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচিশ টাকা এই সকল ছোট-বড় মহালগুলি যাদের অধীনে ছিল, তারা নানা অভিধা বহন করত, যথা জমিদার, ইজারাদার, ঘাটওয়াল, তালুকদার, পতনিদার, মহলদার, জোতদার, গাঁতিদার ইত্যাদি। বড় বড় মহালগুলি জমিদারদেরই অধীনস্থ ছিল। এ সকল জমিদারীর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে বড়, সে সব জমিদারদের প্রায় সামন্ত-রাজার মত আধিপত্য ছিল। দিল্লীর বাদশাহ তাদের রাজা, মহারাজা, খান, সুলতান প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করতেন। তারাই ছিল সাহিত্য, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাদের সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী যা বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "দেশীয় রাজগণ এক সময় দেশের

মহোপকার সাধন করিয়াছেন। যখন সমগ্র দেশ যবন রাজাদিগের করকবলিত হইয়া মুহ্যমান হইতেছিল, তখন তাঁহারা স্বীয় মস্তকে ঝড়বৃষ্টি সহিয়া দেশ মধ্যে জ্ঞানী ও গুণীজনকে রক্ষা করিয়াছেন ; এবং শিল্প সাহিত্য কলাদির উৎসাহ দান করিয়াছেন। যবনাধিকারকালে দেশীয় রাজগণ অনেক পরিমাণে সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাঁহাদের দেয় নির্ধারিত রাজস্ব দিলেই তাঁহারা স্বীয় অধিকার মধ্যে যথেচ্ছ বাস করিতে পারিতেন। সুতরাং তাঁহারা পাত্র, মিত্র, সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখেই বাস করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ইঁহাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া নিরাপদে স্বীয় স্বীয় প্রতিভাকে বিকাশ করিবার অবসর পাইতেন।"

এরূপ জমিদারদের অন্যতম ছিল জঙ্গলমহল ও গোপভূমের সদ্গোপ রাজারা, বাঁকুড়ার মল্লরাজগণ, বর্ধমানের ক্ষত্রিয় রাজবংশ, চন্দ্রকোনার ব্রাহ্মণ রাজারা, নদীয়ার ব্রাহ্মণ রাজবংশ, নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজবংশ ও আরও অনেকে।

জঙ্গলমহলের রাজাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন নারায়ণগড়, নাড়াজোল ও কর্ণগড়ের রাজারা। এর মধ্যে নারায়ণগড়ের আয়তন ছিল ৮১,২৫৪ একর বা ২২৬,৯৬ বর্গমাইল, আর নাড়াজোলের ছিল ৮,৯৯৭ একর বা ১৪.০৪ বর্গমাইল। সুতরাং নারায়ণগড়ই বড় রাজ্য ছিল। কিংবদন্তী অনুযায়ী এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্বপাল। তিনি বর্ধমানের গড় অমরাবতীর নিকটবর্তী দিগ্‌নগর গ্রাম থেকে এসে নারায়ণগড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ৭ জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুরের কালেকটর মিস্টার এচ. বি. বেইলী লিখিত এক মেমোরাণ্ডাম থেকে আমরা জানতে পারি যে নারায়ণগড়ের রাজারাই ছিলেন জঙ্গলমহলের প্রধানতম জমিদার। তাঁদের কুলজীতে ৩০ পুরুষের নাম আছে। তাঁরা খুরদার রাজার কাছ থেকে 'শ্রীচন্দন' ও দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে 'মাড়ি সুলতান' উপাধি পেয়েছিলেন। বেইলী সাহেব এই দুই উপাধি পাবার কারণও উল্লেখ করে গেছেন। যে চন্দনকাষ্ঠ দিয়ে পুরীর জগন্নাথদেবের বিগ্রহ তৈরী হত, তা নারায়ণগড়ের রাজারা সরবরাহ করতেন বলেই খুরদার রাজা তাঁদের 'শ্রীচন্দন' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। 'মাড়ি সুলতান' মানে 'পথের মালিক'। শাহজাদা খুররম (উত্তরকালের সম্রাট শাহজাহান) যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন সম্রাট সৈন্যদ্বারা পরাজিত হয়ে মেদিনীপুরের ভিতর দিয়ে পলায়ন করতে গিয়ে দেখেন যে ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পলায়ন করা অসম্ভব। তখন নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যে তাঁর গমনের জন্য পথ তৈরি করে

দেন। এই উপকারের কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান রক্ত-চন্দনে পাঁচ আঙুলের ছাপবিশিষ্ট এক সনদ দ্বারা তাঁকে 'ঝাড়ি সুলতান' বা 'পথের মালিক' উপাধি দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামার সময় ও ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের বিরুদ্ধে নারায়ণগড়ের রাজারা ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। বেইলী সাহেব নারায়ণগড়ের তৎকালীন ২৫ বৎসর বয়স্ক রাজার জনহিতকর কাজের জন্য খুব প্রশংসা করে গেছেন।

কিংবদন্তী অনুযায়ী কর্ণগড়ের রাজারা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ধমানের নীলপুর থেকে মেদিনীপুরে আসেন। প্রথম যিনি আসেন তিনি হচ্ছেন রাজা লক্ষণসিংহ (১৫৬৮-১৬৬১ খ্রীস্টাব্দ)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁরা কর্ণগড়ের রাজা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন রাজা রামসিংহ (১৬৯৩-১৭১১), রাজা যশোমন্ত সিংহ (১৭২২-১৭৪৮), রাজা অজিত সিংহ (১৭৪৯-১৭৫৬), ও রাণী শিরোমণি (১৭৫৬-১৮১২)। রাজা রামসিংহের আমলেই মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, তাঁর জন্মস্থান যদুপুর থেকে শোভাসিংহের ভাই হিমতসিংহ কর্তৃক বিতারিত হয়ে, কর্ণগড়ে এসে বাস করেন। রাজা যশোমন্ত সিংহের আমলে কর্ণগড়ের দেয় রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৪০,১২৬ টাকা ১২ আনা ও তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল ১৫,০০০। তৎকালীন জঙ্গলমহলের প্রায় সমস্ত রাজা তাঁর অধীনতা স্বীকার করত। রাণী শিরোমণির আমলে প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ ঘটে এবং যদিও যশোমন্ত সিংহের মাতুল নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচন খানের দ্বারা চুয়াড়রা পরাহত হয়, তা হলেও দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সরকার রাণী শিরোমণিকে ওই বিদ্রোহের নেতা ভেবে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিল তাঁকে তাঁর অমাত্য চুনীলাল খান ও নরু বকশীসহ বন্দী করে কলকাতায় নিয়ে আসে। কর্ণগড় ইংরেজ সৈন্যদল কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মুক্ত হবার পর রাণী শিরোমণি আর কর্ণগড়ে বাস করেন নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেদিনীপুরের আবাসগড়ে বাস করে এই নির্ভীক রমণী ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ১৭ সেপটেম্বর তারিখে মারা যান। তারপর কর্ণগড় নাড়াজোল রাজবংশের অধীনে চলে যায়।

নাড়াজোল রাজবংশের আদিপুরুষ হচ্ছেন উদয়নারায়ণ ঘোষ। উদয়নারায়ণের প্রপৌত্রের ছেলে কার্তিকরাম মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে 'রায়' উপাধি পান। তাঁর পর তিন পুরুষ ধরে ওই বংশ ওই উপাধি ব্যবহার করেন। তারপর ওই বংশের

অভিরাম রায় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'খান' উপাধিতে ভূষিত হন। অভিরামের মধ্যমপুত্র শোভারাম খানের পুত্র মতিরাম রাণী শিরোমণির তত্ত্বাবধায়ক হন। মতিরামের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র সীতারাম খান রাজ্যের রক্ষক হন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত এক দানপত্র দ্বারা রাণী শিরোমণি সমস্ত রাজ্য সীতারামের জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দলালকে দান করেন। আনন্দলাল নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। তিনি তাঁর ছোট ভাই মোহনলালকে কর্ণগড় রাজ্য ও মধ্যম ভাই নন্দলালকে নাড়াজোল রাজ্য দিয়ে যান।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত মুকসুদপুরের ভুঁইয়ারাও অতি প্রসিদ্ধ সদ্‌গোপ জমিদার ছিলেন। এছাড়া, মেদিনীপুরে অন্য জাতির জমিদারীও অনেক ছিল। তন্মধ্যে চেতুয়া-বরদার রাজারা, তমলুকের রাজারা, ঝাড়গ্রামের রাজারা, জামবনির রাজারা, ঝাটিবণির রাজারা ও ঘাটশিলার রাজারা উল্লেখের দাবী রাখে। এঁদের অনেকের সঙ্গেই বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের মিত্রতা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তমলুকের রাজা ছিলেন কৈবর্ত জাতিভুক্ত আনন্দনারায়ণ রায়। ময়ূরধ্বজ তাম্রধ্বজ, হংসধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ নামে চারজন রাজার পর আনন্দনারায়ণের ঊর্ধ্বতন ৫৬তম পূর্বপুরুষ বিদ্যাধর রায় এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজারা বহু দেবদেউল নির্মাণ করেন, তন্মধ্যে বর্গভীমের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় ঝাড়খণ্ড বা ঝাড়গ্রাম 'বন্যজাতি' অধ্যুষিত ও ওড়িশা-ময়ূরভঞ্জের বনপথের সংলগ্ন ছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঝাড়গ্রামে যে রাজবংশ রাজত্ব করতেন, তাঁদের আদিপুরুষ ষোড়শ শতাব্দীতে ফতেপুর সিকরি অঞ্চল থেকে পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রে তীর্থ করতে আসেন এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে ঝাড়গ্রামে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকুড়ার মল্লরাজগণের সঙ্গে ঝাড়গ্রামের রাজাদেরও বিশেষ মিত্রতা ছিল।

বর্ধমানের রাজবংশ সম্বন্ধেও অনুরূপ কিংবদন্তী শোনা যায়। ওই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সংগ্রামসিংহ পঞ্জাব থেকে শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে আসেন। ফেরবার পথে তিনি বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে একখানা দোকান করেন। তারপর দোকানদারী থেকে জমিদারী ও জমিদারী থেকে রাজ্য স্থাপন। যাদের জমি গ্রাস করে তিনি রাজ্য স্থাপন করেন, তারা হচ্ছে গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজারা। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে J.C.C Peterson, I. C. S. 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিকটস্ গেজেটিয়ারস্'-এর বর্ধমান খণ্ডে সদ্‌গোপ রাজাদের পরিখাবেষ্টিত নগরীসমূহ, প্রাসাদ, দুর্গ, মূর্তি

ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্মিত হয়ে লিখেছিলেন যে, "একদা দামোদর-অজয় বেষ্টিত ভূখণ্ডের এক বিস্তৃত অঞ্চলে সদ্গোপ রাজাদের আধিপত্য ছিল।" সাম্প্রতিককালে বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন—"গোপভূমের সদ্গোপ রাজবংশের ইতিহাস রাঢ়ের এক গৌরবময় যুগের ইতিহাস। আজও সেই অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন ভালকি, অমরাগড়, কাঁকশা, রাজগড়, গৌরাঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে রয়েছে। বাঙলার সংস্কৃতির ইতিহাসে সদ্গোপদের দানের গুরুত্ব আজও নির্ণয় করা হয়নি।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোপভূমে যে সদ্গোপ রাজা রাজত্ব করছিলেন তাঁর নাম শতক্রতু। ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে শতক্রতু মারা গেলে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র রাজা হন। মহেন্দ্র নিজ পিতৃরাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিতে রাজা মহেন্দ্রের কথা বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। যখন জগৎশেঠের বাড়িতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে সভা আহূত হয়, তখন রাজা মহেন্দ্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নবাবের বিপক্ষে বিরোধী হওয়ার জন্য তাঁর রাজ্য বর্ধমানের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙলায় আরও রাজা মহারাজা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। যেমন চন্দ্রকোনার রাজারা, নাটোরের রাজবংশ, নদীয়ার রাজবংশ ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নাটোরের জমিদার ছিলেন রাজা রামকান্ত রায়। ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে রামকান্তের মৃত্যুর পর তাঁর ৩২ বৎসর বয়স্কা বিধবা রাণী ভবানী নাটোরের বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী হন। ওই বিশাল জমিদারী কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনার স্বাক্ষর তিনি ইতিহাসের পাতায় রেখে গেছেন তাঁর জমিদারীর বাৎসরিক আয় ছিল দেড় কোটি টাকা। নবাব সরকারে সত্তর লক্ষ টাকা রাজস্ব দিয়ে বাকী টাকা তিনি হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ প্রতিপালন, দীনদুঃখীর দুর্দশামোচন ও জনহিতকর কার্যে ব্যয় করতেন। বারাণসীতে তিনি ভবানীশ্বর শিব স্থাপন করেছিলেন ও কাশীর বিখ্যাত দুর্গাবাড়ী, দুর্গাকুণ্ড ও কুরুক্ষেত্রতলা জলাশয় প্রভৃতি তাঁর কীর্তি। বড়নগরে তিনি ১০০টি শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন। যদিও সিরাজউদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে তিনি ইংরেজ পক্ষকেই সাহায্য করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর জমিদারীর কিয়দংশ

ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর বাহেরবন্দ জমিদারী ওয়ারেন হেস্টিংস বল-পূর্বক কেড়ে নিয়ে কান্তবাবুকে দিয়েছিলেন। পাঁচশালা বন্দোবস্তের সুযোগ নিয়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও তাঁর রংপুরের কয়েকটা পরগণা হস্তগত করেছিলেন।

রাণী ভবানীর সমসাময়িক কালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জমিদারী পরিচালনা করতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর আয়তনও বিশাল ছিল। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যের সীমানা সম্বন্ধে বলেছেন—"রাজ্যের উত্তরসীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গাভাগীরথী খাদ। দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের খাদ। পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার।" সিরাজ-উদ্দৌলাকে গদিচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে তিনিও ইংরেজদের সাহায্য করেন। এর প্রতিদানে তিনি ক্লাইভের কাছ থেকে পাঁচটি কামান উপহার পান। কিন্তু পরে খাজনা আদায়ের গাফিলতির জন্য মীরকাশিম তাঁকে মুঙ্গের দুর্গে বন্দী করে রাখে। ইংরেজের সহায়তায় তিনি মুক্তি পান।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজের কেন্দ্রমণি। ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের মাঘ মাসে তিনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তাঁর ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। বাঙলা, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মিথিলা, উৎকল ও বারাণসীর বিখ্যাত পণ্ডিতরা এই যজ্ঞে আহূত হয়েছিলেন। এছাড়া, তাঁর সভা অলঙ্কৃত করত বহু গুণিজন যথা গোপাল ভাঁড়, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। নাটোর থেকে একদল মৃৎশিল্পী এনে, তিনি কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মৃৎশিল্পের প্রবর্তন করেন। বাঙলা দেশে জগদ্ধাত্রী পূজারও তিনি প্রবর্তক।

বাঁকুড়ার মল্লরাজগণের রাজধানী ছিল বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর জঙ্গলমহলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ তাদের গৌরবের তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। গোপাল সিংহের রাজত্বকালে বর্গীদের আক্রমণে রাজ্যটি বিধ্বংস হয় ও তার পতন ঘটে। কিন্তু এক সময় তারা এক বিশাল ভূখণ্ডের অধিপতি ছিল। এই ভূখণ্ড উত্তরে সাঁওতাল পরগণা থেকে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত এবং পূর্বদিকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে পঞ্চকোট, মানভূম ও ছোটনাগ-পুরের কিয়দংশ তাদের জমিদারীভুক্ত ছিল। মল্লরাজগণের আমলে বিষ্ণুপুর

রেশম চাষ ও সংস্কৃত চর্চার একটা বড় কেন্দ্র ছিল। মল্লরাজগণ প্রথমে শৈব ছিলেন, কিন্তু পরে শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি রাজা বীর হাম্বির (১৫৯১-১৬১৬), রঘুনাথ সিংহ (১৬১৬-৫৬), দ্বিতীয় বীরসিংহ (১৬৫৬-১৬৭৭), দুর্জন সিংহ (১৬৭৮-১৬৯৪) প্রমুখের আমলে নির্মিত হয়। এদের পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের রাজ্য বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন রাজা সীতারাম রায়, বঙ্কিম যাঁকে তাঁর উপন্যাসে অমর করে গেছেন। যশোহরের ভুষনা গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা উদয়নারায়ণ ছিলেন স্থানীয় ভূম্যধিকারী। মহম্মদ আলি নামে একজন ফকিরের কাছ থেকে তিনি আরবী, ফারসী ও সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে তিনি পিতার জমিদারীর সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে নিজেই 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন। মুরশিদকুলি খান তাঁকে দমন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি ঐশ্বর্যমত্ত হলে, তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়। সেই সুযোগে নবাবের সৈন্য তাঁর আবাসস্থল মহম্মদপুর আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে। কথিত আছে তাঁকে শূলে দেওয়া হয়েছিল।

পাঁচ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিনপাদে সামন্ত রাজগণের আমলে আমরা নিষ্ঠাবান সমাজ ও সাহিত্যের ধারাবাহিকতাই লক্ষ্য করি। বাংলা সাহিত্য তখনও তার পূর্ববর্তী খাতেই প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাঙলার সামন্তরাজগণ ও জমিদারবৃন্দ। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলকাব্য ও পৌরাণিক কাব্যসমূহের ধারা স্তিমিত হয়নি। কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা করেছিলেন তাঁর 'শিবায়ন', বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘনরাম চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন তাঁর 'ধর্মমঙ্গল', ও নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র রচনা করেছিলেন তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর'। শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে গঙ্গাধর দাস রচনা করেছিলেন তাঁর 'জগৎমঙ্গলা' কাব্য। এই গঙ্গাধরেরই অগ্রজ ছিলেন 'মহাভারত' রচয়িতা কাশীরাম দাস। শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই রচিত হয়েছিল আরও তিনখানা ধর্মমঙ্গল কাব্য—১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে মানিক গাঙ্গুলির, ১৭৯০

খ্রীস্টাব্দে রামকান্তের ও ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে গোবিন্দরামের। অনুবাদ সাহিত্যে শতাব্দীর প্রারম্ভেই শঙ্কর কবিচন্দ্র রচনা করলেন তাঁর 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত', ও শতাব্দীর শেষের দিকে (১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে) রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করলেন তাঁর 'রামায়ণ'। এছাড়া রচিত হয়েছিল শচীনন্দন কর্তৃক তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি', রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি', জয়নারায়ণ সেন কর্তৃক তাঁর 'হরিলীলা', জগৎনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'আত্মবোধ', ও জয়নারায়ণ ঘোষাল কর্তৃক পদ্মপুরাণের 'কাশীখণ্ড'। শতাব্দীর শেষের দিকে অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখনীয় সংযোজন হচ্ছে গোলকনাথ দাস কর্তৃক ইংরেজি নাটক Disguise-এর বাংলা অনুবাদ, যা হেরেসিম লেবেডফ কর্তৃক ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে মঞ্চস্থ হয়েছিল তাঁর ডোমতলার বেঙ্গল থিয়েটারে।

বাঙলার অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস চিহ্নিত হয়ে আছে দুই বীভৎস ঘটনার দ্বারা। একটা হচ্ছে বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২-৫১) ও আর একটা হচ্ছে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১৭৬৯-৭০)। প্রথমটার ভীতিপ্রদ চিত্র আমরা তিনখানা বই থেকে পাই, কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আরও ভয়ঙ্কর ঘটনা হলেও সমসাময়িক কোন গ্রন্থে এর ভীতিপ্রদ চিত্রটা অঙ্কিত হয়নি। বাংলা সাহিত্যের এই শূন্যতা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকটা ঝঙ্কৃত হয়েছিল রামপ্রসাদ, নিধুবাবু ও রামরাম বসুর গানে। নিধুবাবুর টপ্পা এক সময় বাঙালীর কানে সুধাবর্ষণ করত, এবং রামপ্রসাদের গান আজও বাঙালীর অন্তরকে মুগ্ধ করে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ অবদান বিষ্ণুপুর ঘরাণার উদ্ভব। এটা ধ্রুপদেরই একটা বিশেষ ঘরাণা। এই ঘরাণার বিশিষ্ট কলাবিদদের মধ্যে ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, নিতাই নাজীর ও বৃন্দাবন নাজীর। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক এই ঘরাণার সাংগীতিক খ্যাতি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত মধ্য-যুগের সাহিত্যধারার পাশে আর একটা নূতন (মৌখিক) সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এটা হচ্ছে কবির গান। কবির গান এ সময় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামন্তরাজগণ ও জমিদারগণের আমলে বাঙলায় নির্মিত হয়েছিল বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্য রীতিতে (চালা, রত্ন, শিখর, দালান ইত্যাদি)

বহু মন্দির। এই সকল মন্দিরের বৈশিষ্ট্য ছিল মন্দিরগুলির গায়ে পোড়ামাটির অলঙ্করণ। পোড়ামাটি অলঙ্করণের বিষয়বস্তু ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বৃত্তান্ত, সমকালীন সমাজচিত্র, বন্ত-পশুর অনায়াস বিচরণভঙ্গী ও সাবলীল গতিবেগ, এবং ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি। রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে হরধনু-ভঙ্গ, রামসীতার বনগমন, শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন, মারীচবধ, রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ, জটায়ুবধ, অশোকবনে সীতা প্রভৃতি এবং মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, শকুনীর পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধদৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা, প্রভৃতি। পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে বিষ্ণুর দশাবতার, দশদিক্‌পাল, দশমহাবিদ্যা, ও অন্যান্য মাতৃকাদেবীসমূহ এবং অন্যান্য জনপ্রিয় পৌরাণিক উপাখ্যান যথা—শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি। সামাজিক দৃশ্যসমূহের মধ্যে আছে বারাঙ্গনা বিলাস ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, বেদে-বেদেনীর কসরৎ, নানারূপ ঘরোয়া দৃশ্য ও বাঙালী রমণীর বিদেশীর নিকট প্রেম নিবেদন। এ ছাড়া, কয়েকটি মন্দিরে আছে যৌন-ক্রীড়ারত মিথুন মূর্তি।

বলা-বাহুল্য যে মন্দিরগাত্রের এই সব অলঙ্করণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর ধর্মীয় সচেতনতা ও জীবনচর্যার সজীব চিত্র।

ছয়

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারিগণের পঙ্গুতা ও সেই অবসরে বাঙলার নবাবদের স্বাধীন শাসক হিসাবে আচরণ, ও এই বিশৃঙ্খলতার সুযোগে ইংরেজদের চক্রান্ত ও পরে আধিপত্য স্থাপন—এই নিয়েই বাঙলার অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। প্রথম যিনি নবাবী আমলের উদ্বোধন করেন, তিনি হচ্ছেন মুরশিদকুলি খান। ঔরঙ্গজেব জীবিত থাকাকালীন মুরশিদকুলি খান বাঙলায় যথেষ্ট শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। কথিত আছে মুরশিদকুলি খান দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। শৈশবকালে দস্যুরা তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে পারস্যদেশীয় এক বণিকের কাছে বেচে দেয়। পারস্যদেশীয় এই বণিক তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে নানারূপ বৈষয়িক বিষয়ে তাকে শিক্ষা দেন। ঔরঙ্গজেব যখন তাঁর পিতা

শাহজাহানের আমলে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন, মুরশিদকুলি খান তখন তাঁর অধীনে দাক্ষিণাত্যের রাজস্ববিভাগে কর্ম গ্রহণ করে। ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সম্রাট হন, তখন তিনি মুরশিদকুলি খানকে কর্মপটু দেখে তাকে ঢাকায় সুবে বাঙলার দেওয়ান করে পাঠান। কিন্তু সুবাদার আজিম-উস-শানের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায় মুরশিদকুলি খাঁন ১৭০১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে তার দপ্তর উঠিয়ে নিয়ে আসেন। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ারের আমলে মুরশিদকুলি খান বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার সুবাদার নিযুক্ত হন। তখন থেকে তিনি মুকসুদাবাদের নাম বদল করে নিজ নাম অনুসারে মুরশিদাবাদ রাখেন। সে সময় থেকেই মুরশিদাবাদ বাঙলার রাজধানী হয়, এবং বাঙলার সুবাদাররা দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্ক রেখে স্বাধীন নবাব হিসাবে শাসন করতে থাকেন। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার সুবাদার হন। সুজার মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান বাঙলার নবাব হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খান সরফরাজের কর্মচারীদের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করে তাঁকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে মুরশিদাবাদের মসনদ দখল করে নেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব হন। ইংরেজদের তিনি বিরোধী থাকায়, ইংরেজরা তাঁর সেনাপতি মীরজাফরের সঙ্গে চক্রান্ত করে তাঁকে পলাশীর যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। তাঁকে নিহত করে মীরজাফরকে মুরশিদাবাদের মসনদে বসানো হয়। পরে মীরকাশিম এবং তারও পরে পুনরায় মীরজাফর নবাব হয়। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নজমউদ্দৌলার সময় ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করেন। তখন থেকে ইংরেজরাই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজরা প্রথম বাঙলায় আসে ১৬৫১ খ্রীস্টাব্দে। তারা সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে একটা ফারমান পায়। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব সম্রাট হবার পর হুগলির ফৌজদার সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক প্রদত্ত ফারমান বাতিল করে দেয়। এর ফলে ইংরেজদের বাণিজ্য ব্যাহত হয়। নবাবের সঙ্গে তাদের ঝগড়া চলতে থাকে। শীঘ্রই তা সংঘর্ষ ও যুদ্ধে পরিণত হয়। ইংরেজরা নবাবের ফৌজকে পরাজিত করে হুগলি তছনছ করে দেয়। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে

ইংরেজরা হুগলিতে থাকা আর যুক্তিযুক্ত নয় মনে করে, জোব চার্নকের নেতৃত্বে হুগলি পরিত্যাগ করে সুতানটিতে এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। তারপর ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ইংরেজরা মাত্র ১৬ হাজার টাকায় কলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিন গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেয়। এখানেই তারা তাদের প্রথম দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ করে। এইভাবে ভাবীকালের রাজধানী কলকাতা শহর প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলকাতায় শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের পর ইংরেজরা ব্যস্ত হয় ভারতে শাসন বিস্তারে। সমসাময়িক রাজনৈতিক চক্রান্ত ইংরেজদের সহায় হয়। বাঙলার নবাব সিরাজকে তারা অপসারণ করে। তার পরিণতিতে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে তারা দেওয়ানী লাভ করে ভারতের প্রকৃত শাসক হয়ে দাঁড়ায়। সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত মুরশিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাকট অনুযায়ী কলকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ওই সালেই ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। আবার চক্রান্ত চলে। সুপ্রিম কোর্টের বলি হন এক ব্রাহ্মণ সন্তান—মহারাজ নন্দকুমার। এই ব্রহ্মহত্যা করে ইংরেজ তার প্রবল প্রতাপান্বিত শাসনশক্তির পরিচয় দেয়। এর কোন সক্রিয় প্রতিবাদ দেশের মধ্যে হল না। অনুগ্রহ দান করে ইংরেজ নাগরিক সমাজকে পঙ্গু করে রেখেছিল। সামন্তরাজগণ ও জমিদারদের ইংরেজ ভীতিগ্রস্ত করে তুলল। রাণী ভবানীর জমিদারীর এক অংশ কেড়ে নিয়ে কান্তবাবুকে দিল। আর এক অংশ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দখল করে নিল। তারপর জমিদারদের সম্পূর্ণ নির্জীব করে দিল ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা। তার উদ্ভবের কথা নীচের অনুচ্ছেদে বলছি।

সাত

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী পাবার পরের সাত বৎসর ইংরেজ পূর্বতন ভূমি-রাজস্ব প্রশাসন বলবৎ রাখে। মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব-দেওয়ানরূপে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ভার দেওয়া হয়। এর ফলে দ্বৈতশাসনের উদ্ভব হয়। দ্বৈত-শাসনের ফলে অরাজকতা ও স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। কৃষি-ব্যবস্থা বিশেষ-ভাবে বিপর্যস্ত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর কৃষকদের মধ্যে অর্ধেক মারা যাওয়ার ফলে, আবাদী জমির অর্ধাংশ অনাবাদী হয়ে পড়ে। দেয় রাজস্বের

অর্ধাংশও আদায় হয় না। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস জমিদারী মহাল-গুলিকে নিলামে চড়িয়ে দিয়ে ইজারাদারদের সঙ্গে পাঁচশালা বন্দোবস্ত করে। কিন্তু পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতি গুরুতর দেখে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটায় ও নিজেরাই দেওয়ানরূপে রাজস্ব আদায়ের ভার নেয়। ১৭৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দে বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত করা হয়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশের আমলে এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কোম্পানির প্রত্যাশা সিদ্ধিলাভ করে না। 'সূর্যাস্ত আইন' অনুযায়ী অনাদায়ী মহালগুলিকে নিলামে চড়ানো হয়। কলকাতার নব্য-ধনিকেরা নিলাম থেকে সে সব মহাল কিনে নিয়ে নিজেরা জমিদার হয়ে বসে। কৃষিকলাবিদ, উদ্যোগী, ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী জমিদারদের পরিবর্তে সৃষ্ট হয় এক প্রবাসী, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও রায়তদের ওপর অত্যাচারী জমিদার শ্রেণী। দেশের সামাজিক বিন্যাস এতে বিপর্যস্ত হয়। বাঙলার সামন্তরাজগণ ও জমিদারবৃন্দের প্রতাপ, প্রতিপত্তি ও গৌরবের এখানেই ছেদ ঘটে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য তার এক বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা হারায়।

আট

ইংরেজ দেশের শাসনভার নেবার পর থেকেই, রাজস্ব আদায়ের ব্যাপার নিয়ে বাঙলার বহু জায়গায় কৃষক ও আদিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এর ফলে ঘটে সংঘর্ষ ও বিদ্রোহ। ১৭৬০ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মোট আটটা বিদ্রোহ ঘটে, যথা ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ, ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের সন্দীপের বিদ্রোহ, ১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ত্রিপুরার বিদ্রোহ, ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ঘরুই বিদ্রোহ, ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের চাকমা বিদ্রোহ ও ১৭৯৮-৯৯ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ। মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহল ও তার সংলগ্ন পশ্চিম ও উত্তরের অরণ্যভূমি অঞ্চলের আদিবাসীদের চুয়াড় বলা হত। তারা কৃষিকর্ম করত না এবং পশুপক্ষী শিকার ও বনজঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করে জীবিকা-নির্বাহ করত। স্থানীয় জমিদাররা তাদের পাইক-বরকন্দাজের কাজে নিযুক্ত করত এবং বেতনের পরিবর্তে নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করতে দিত। এরূপ নিষ্কর জমিকে 'পাইকান' বলা হত। ১৭৬০

খ্রীস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হলে, ইংরেজরা নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে জমিদার ও তৎসঙ্গে চুয়াড়দের দমন করবার চেষ্টা করে। এর ফলেই বিদ্রোহ হয় এবং একেই চুয়াড় বিদ্রোহ বলা হয়। চুয়াড় বিদ্রোহের নায়ক ছিল গোবর্ধন দিকপতি। জঙ্গলের চুয়াড়গণ গোবর্ধনের নেতৃত্বে কর্ণগড় রাজ্য আক্রমণ করে (১৭৬০)। কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি ভীত হয়ে নাড়াজোলের রাজা ত্রিলোচন খানের আশ্রয় নেন। ত্রিলোচন খান চুয়াড়দের পরাস্ত করেন। কিন্তু ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে আবার দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ হয়। দিকপতির নেতৃত্বে প্রায় ৪০০ বিদ্রোহীর বাহিনী চন্দ্রকোনা পরগনা ও মেদিনীপুর জেলার বৃহত্তম গ্রাম আনন্দপুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। ইংরেজরা চুয়াড়দের দমন করে, কিন্তু রাণী শিরোমণিকে এই বিদ্রোহের নেত্রী ভেবে, তাঁকে কলকাতায় এনে বন্দী করে রাখে। পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তন্তুবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তুবায়রা বিদ্রোহ করে। ইতিহাসে একে তন্তুবায় আন্দোলন বলা হয়। শান্তিপুরে এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিল বিজয়রাম ও ঢাকায় দুনিরাম পাল। এদের পর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় লোচন দালাল, কৃষ্ণচন্দ্র বড়াল, রামরাম দাস, বোষ্টম দাস প্রমুখ। ইংরেজ বণিকদের শর্ত মেনে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর না করায় ইংরেজরা বোষ্টম দাসকে তাদের কুঠিতে আটক করে তার ওপর অত্যাচার করে। সেই অত্যাচারের ফলে বোষ্টম দাস মারা যায়।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণায় কৃষকরা সমশের গাজী নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সমশের কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর দখল করে ও সেখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে কৃষকদের মধ্যে জমিবণ্টন ও কর মকুব, জলাশয় খনন প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করে। নবাব মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় সমশের বাহিনীকে পরাজিত করে। সমশেরকে বন্দী করে মুরশিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। পরে নবাবের হুকুমে তাকে তোপের মুখে ফেলে হত্যা করা হয়।

এই সময়ে মেদিনীপুরের ঘরুই উপজাতিরা বিদ্রোহ করে। দুবার বিদ্রোহ হয়। প্রথমবার জমিদার শত্রুঘন চৌধুরীর পুত্র নরহর চৌধুরী রাত্রিতে নিরস্ত্র ঘরুইদের এক সমাবেশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে ৭০০ ঘরুইকে হত্যা করে। দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ হয় ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। এবারও ঠিক আগের মতই রাত্রিকালে

আক্রমণ চালিয়ে বহু ঘরুইকে হত্যা করা হয়।

চাকমা উপজাতির মধ্যেও একাধিকবার বিদ্রোহ হয়। প্রথম চাকমা বিদ্রোহের (১৭৭৬-৭৭) নায়ক ছিল রামু খাঁ। সে চাকমা জাতিকে একত্রিত করে প্রথম কার্পাস কর দেওয়া বন্ধ করে ও তার সঙ্গে ইংরেজদের বড় বড় ঘাঁটিসমূহ ধ্বংস করে দেয়। ইংরেজ বাহিনী এসে এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহে চাকমা দলপতি শের দৌলত অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছিল। পিতার পর শের দৌলতের ছেলে জানবক্স খাঁ দ্বিতীয় চাকমা বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে। তার সময় (১৭৮৩-৮৫ খ্রীস্টাব্দে) কোন ইজারাদারই চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেনি। বহুদিন সে স্বাধীনভাবে শাসন করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ হচ্ছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহেই আমরা প্রথম এক মহিলাকে নেতৃত্ব করতে দেখি। সেই মহিলা হচ্ছে দেবী চৌধুরানী। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হচ্ছে ভবানী পাঠক। ইংরেজরা তাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দেয়। ভবানী পাঠক ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করে। দেবী চৌধুরানীর সহায়তায় সে ইংরেজদের ওপর হামলা চালায়। তার ফলে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। লেফটানেণ্ট ব্রেনোর নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজ বাহিনী তাকে এক ভীষণ জল-যুদ্ধে পরাজিত করে, ও ভবানী পাঠক নিহত হয়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর এক নেতা ছিল কৃপানাথ। কৃপানাথ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রংপুরের বিশাল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল অধিকার করে। তার ২২ জন সহকারী সেনাপতি ছিল। রংপুরের কালেকটর ম্যাকডোয়াল পরিচালিত বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্বারা জঙ্গল ঘেরাও হলে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিদ্রোহিগণ বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিল ফকির সম্প্রদায়ের মজনু শাহ। মজনুর কার্যকলাপে উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় ইংরেজরা নাস্তানাবুদ হয়। সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে তাকে দমন করা সম্ভবপর হয় না। ভবানী পাঠকের সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মজনুর ফকির দলের একবার সংঘর্ষ হয়, কিন্তু পরে তারা পুনরায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের কার্যকলাপ চালায়। তাদের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত ছিল জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় করা, ইংরেজ সরকারের কোষাগার লুণ্ঠন

করা ইত্যাদি। তবে সাধারণ জনসাধারণের ওপর তারা অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ করত না। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে মজনু পাঁচশত সৈন্যসহ বগুড়া জেলা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করার পথে কালেশ্বর নামক জায়গায় ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক মারাত্মকভাবে আহত হয়। মজনুর দল বিহারের সীমান্তে পালিয়ে যায়। মাখনপুর নামক স্থানে মজনুর মৃত্যু হয়।

ফকির সম্প্রদায়ের অপর এক প্রধান নেতা ছিল সোভান আলি। সোভান আলি বাঙলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত অঞ্চলে ইংরেজ সরকার ও জমিদারদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। দিনাজপুর, মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি ও মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সময় তার সহকারী জহুরী শাহ ও মতিউল্লা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে কারারুদ্ধ হয়। সোভান পরে আমুদী শাহ নামে এক ফকির নায়কের দলে যোগ দেয়। এ দলও ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়। এর পরেও সোভান ৩০০ অনুচর নিয়ে ১৭৯৭-৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছোট ছোট আক্রমণ চালায়। লর্ড ওয়েলেসলী তাকে গ্রেপ্তারের জন্য চার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

নয়

আগেই বলেছি যে বাঙলার অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস চিহ্নিত হয়ে আছে দুই বীভৎস ঘটনার দ্বারা। একটা হচ্ছে বর্গীর হাঙ্গামা ও আরেকটা হচ্ছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দী খানের শাসনকালে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কররাম কোলাহাতকরের (ওরফে ভাস্কর পণ্ডিত) নেতৃত্বে একদল মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য বাঙলাদেশে এসে উৎপাত শুরু করে। এটাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে পরিচিত। এই হাঙ্গামা স্থায়ী ছিল ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ পর্যন্ত। প্রথম বছর যখন তারা আসে, আলীবর্দী খান তখন বাঙলায় ছিলেন না, ওড়িশায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরবার পথে যখন তিনি বর্ধমান শহরে রাণীদীঘির কাছে আসেন, মারাঠা অশ্বারোহীরা তাঁর শিবির অবরোধ করে। নবাব অতি কষ্টে সেখান থেকে কাটোয়ায় পালিয়ে যান। মারাঠারা সংখ্যায় পঁচিশ হাজার ছিল। তারা ভাগীরথী অতিক্রম করে মুরশিদাবাদে এসে লুটপাট করে। জগৎশেঠের বাড়ি থেকে তারা অনেক ধনদৌলত সংগ্রহ করে। ইতিমধ্যে আলিবর্দী খান মুরশিদাবাদে এলে বর্গীরা

কাটোয়ায় পালিয়ে যায়।' পূজার সময় বর্গীরা কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটায় দুর্গাপূজা করে। নবমীর দিন আলিবর্দী অতর্কিতে তাদের আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়। তারপর বালেশ্বর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা চিলকা হ্রদের দক্ষিণে পালিয়ে যায়। কিন্তু বর্গীদের হাঙ্গামা এক বছরের ব্যাপার নয়। নয় বছর ধরে এটা বাৎসরিক অভিযানে দাঁড়ায়। এই নয় বছরের উৎপাতের ফলে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ অঞ্চলসমূহ বিশেষ করে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়ে। লুটপাট ও গণহত্যা ছাড়া, তারা ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ করত। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—'লুঠি-বাঙলার লোক করিল কাঙাল। গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল॥ কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। লুঠিয়া লইল ধন ঝিহুড়ী বহুড়ী॥' অনুরূপ বর্ণনা মহারাষ্ট্রপুরাণ ও চিত্রচম্পূতেও আছে।

বর্গীর হাঙ্গামা ঘটেছিল পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরেজদের দেওয়ানী পাবার আগে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে দেওয়ানী পাবার চার-পাঁচ বছর পরে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ই ইংরেজ শাসনের শোষক রূপটা ফুটে ওঠে। এরকম ভয়াবহ ও মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ বাঙলা দেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে অনাবৃষ্টির জন্য চালের ফলন কম হয়। তার ফলে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়া থেকেই চালের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার সৈন্যবাহিনীর জন্য ৬০ হাজার মণ চাল বাজার থেকে কিনে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির কর্মচারীরাও ফাটকাজনিত মুনাফা লোভের আশায় বাজার থেকে চাল সংগ্রহ করতে থাকে। এর ফলেই ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়, যার বর্ণনা হাণ্টারের 'অ্যানালস্ অভ্ রুরাল বেঙ্গল' ও বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এ পাওয়া যায়। মন্বন্তরের পরের দু'বছর বাঙলা আবার শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠেছিল। লোক পেট ভরে খেতে পেল বটে, কিন্তু লোকের আর্থিক দুর্গতি চরমে গিয়ে পৌঁছাল। অত্যধিক শস্যফলনের ফলে কৃষিপণ্যের দাম এমন নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছাল যে হাণ্টার বলেছেন যে হাটে শস্য নিয়ে গিয়ে বেচে গাড়ী ভাড়া তোলাই দায় হল। এদিকে ইংরেজ তার শোষণ নীতি পূর্ণোদ্যমে চালাতে লাগল, এবং তার জন্য নির্যাতনও বাড়তে লাগল। শুধু তাই নয় খাজনার পরিমাণও বাড়িয়ে দিল। কিন্তু বাড়ালে কি হবে? আধা রাজস্ব আদায় হল না। কৃষকের দুর্গতির পরিসীমা রইল না। জমিদাররা খাজনা

দিতে না পারায়, তাদের জমিদারীসমূহ নিলামে উঠল

দশ

এবার গ্রামীন জীবনচর্যা সম্বন্ধে কিছু বলব। বিভিন্ন জাতির এক একটা কৌলিক বৃত্তি ছিল। কৌলিক বৃত্তিধারী এই সকল জাতিরাই ছিল সমাজের 'টেকনোলজিস্টস্' বা মেরুদণ্ড। তবে ধনগরিমায় সমাজের শীর্ষে ছিল বণিক সম্প্রদায়। সাধারণ লোক ধন-দৌলতের মধ্যে অবগাহন না করলেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বাস করত। সকল জাতির লোকেরাই চাষবাস করত। সুফলার বছরে কারুরই অন্নকষ্ট হত না। পুকুর থেকে পেত প্রয়োজনীয় মাছ, গোয়াল থেকে দুধ ও নিজ বাগিচা থেকে শাক-সবজী। সকলেই সুতা কাটত ও তা দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিত। সাধারণ লোকের ছিল ধুতি ও চাদর বা গামছা। মেয়েরা পরত শাড়ী। তাদের কোন রকম অন্তর্বাস বা উত্তরবাস ছিল না। শাড়ীখানাই ওপরের অঙ্গে জড়িয়ে ঘোমটা দিত। অন্তর্বাস ছিল না বলে শাড়ীর মধ্যভাগে পাছার কাছে আর একটা পাড় থাকত। এরূপ শাড়ীকে পাছাপাড় শাড়ী বলা হত।

তবে বিত্তশালী সমাজের পোশাক-আশাক অন্য রকমের হত। তারা প্রায়ই রেশমের কাপড়, পায়ে ভেলভেটের ওপর রূপার কাজ করা জুতা, কানে কুণ্ডল, দেহের ওপর অংশে আঙরাখা, মাথায় পাগড়ি ও কোমরের নীচে কোমরবন্ধ পরত। পুরুষরা দেহ চন্দনচর্চিত করত, আর মেয়েরা স্নানের সময় হলুদ ও চন্দন চূর্ণ দিয়ে দেহমার্জিত করত। মাথার কেশপাশ আমলকীর জলে ধৌত করত। অভ্রের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচরাত ও নানারকম খোঁপা বাঁধত।

সধবা মেয়েরা সকলেই হাতে নোয়া ও শাঁখা পরত। তা'ছাড়া থাকত হাতে কঙ্কণ, পায়ে মল, কোমরে গোট, গলায় হার, কানে মাকড়ি, নাকে নোলক ও নথ।

মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে দিনের বেলা সকলেই কাজকর্মে ব্যস্ত থাকত। রাত্রিবেলা মঙ্গলকাব্য বা পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত পাঁচালী গান শুনত। এ ছাড়া ছিল নানারকম বারব্রত ও পালপার্বণ। দোল দুর্গোৎসবের সময় মহাঘটা হত। দুটা লৌকিক পার্বণও ছিল। একটা অরন্ধন ও আর একটা পৌষপার্বণ। এছাড়া ছিল অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান যথা বিবাহ, শ্রাদ্ধ,

মেয়েদের সাধ, রজঃদর্শন, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ, আটকৌড়ে, চারকৌড়ে ইত্যাদি। বিবাহে কন্যাপণ দেওয়াই রীতি ছিল, তবে কুলীন ব্রাহ্মণরা বরপণ পেতেন। কৌলীন্য প্রথা দ্বারা সমাজ ভীষণভাবে কলুষিত ছিল। কুলরক্ষার জন্য কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে নিজের কুলরক্ষা করতে হত। প্রায়ই কুলীন ব্রাহ্মণগণ অগণিত বিবাহ করত ও স্ত্রীকে তার পিত্রালয়েই রেখে দিত। ভারতচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে লিখেছেন—"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥ যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই। বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥ বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে। পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে॥ বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটিঘাটি। জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি॥ দু'চারি বৎসরে যদি আসে একবার। শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥ সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়। তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥" এছাড়া আঠারো শতকের সমাজে ছিল বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, সতীদাহ, দেবদাসী প্রথা ও দাসদাসীর কেনাবেচা।

এগার

এই গ্রামীণ সমাজের কাছে তাদের ধনগরিমার ডাঁট দেখাবার জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতায় গঠিত হয়েছিল এক নাগরিক সমাজ। এই সমাজের সমাজপতিরা বাঙলার প্রাচীন বনিয়াদী পরিবারের লোক ছিলেন না। এঁরা সামান্য অবস্থা থেকে দেওয়ানী, বেনিয়ানী, খোসামুদী, দালালী, নারী সংঘটন ও নানারকম চক্রান্তে যোগ দিয়ে, ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভ করে কলকাতার অভিজাত পরিবারসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই অভিজাত পরিবারের লোকদের 'বাবু' বলা হত। রাত্রে বাড়ীতে থাকা তাঁরা আভিজাত্যের হানিকর মনে করতেন। বারবনিতার গৃহেই তাঁরা রাত্রিটা কাটাতেন। শহরে বারবনিতার প্রসারে তাঁরাই ছিলেন সহায়ক। পরবর্তী শতাব্দীর নবজাগরণ এঁদের দ্বারা সংঘঠিত হয়নি। নবজাগরণ সংঘটিত হয়েছিল এক শিক্ষিত সমাজের প্রয়াসে। এই শিক্ষিত সমাজের অভ্যুত্থান ঘটে মুদ্রণের প্রবর্তনে ও তার পরিণতিতে স্কুল, কলেজ ইত্যাদি স্থাপনের ফলে। মুদ্রণের প্রবর্তন হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমলে। মাত্র মুদ্রণ

নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। বাণিজ্যের প্রসার, ডাকের প্রবর্তন, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ, জ্ঞানানুশীলনের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন, নাট্যাভিনয়, ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন ইত্যাদি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই ঘটেছিল। এক কথায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকটাই ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রস্তুতিপর্ব।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচিত হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও পঙ্গুতার পরিপ্রেক্ষিতে। শতাব্দীর সূচনায় ঔরঙ্গজেবই দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। এই পতন ত্বরান্বিত হয় ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর। এই পতনের অন্তরালেই বাঙলায় নবাবী আমলের সূত্রপাত হয়। তারপর চলে ইংরেজের চক্রান্ত। ইংরেজই দেশের প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। তারই পরিণামে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে গদিচ্যুত করে। ১৭০৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত এই ১৫০ বৎসর সময়কালের মধ্যে বারো জন মুঘল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। যথাক্রমে তাঁরা হচ্ছেন—

১) প্রথম বাহাদুর শাহ (ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র)। শাসনকাল ১৭০৭ থেকে ১৭১২ পর্যন্ত।

২) জাহান্দার শাহ (প্রথম বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। শাসনকাল ১৭১২ থেকে ১৭১৩ পর্যন্ত।

৩) ফারুকশিয়ার (প্রথম বাহাদুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র আজিম-উস্-শানের পুত্র)। শাসনকাল ১৭১৩ থেকে ১৭১৯।

৪) রাফি-উদ-দৌলত (প্রথম বাহাদুর শাহের তৃতীয় পুত্র রাফি-উস-শানের জ্যেষ্ঠ পুত্র)। শাসনকাল ১৭১৯।

৫) রাফি-উদ-দরজাত (প্রথম বাহাদুর শাহের তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র)। শাসনকাল ১৭১৯।

৬) নিকুশিয়ার (ঔরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র আকবরের পুত্র)। শাসনকাল ১৭১৯।

৭) মহম্মদ শাহ (প্রথম বাহাদুর শাহের চতুর্থ পুত্র জহানশাহের পুত্র)। শাসনকাল ১৭১৯-১৭৪৮।

৮) আহমদ শাহ (মহম্মদ শাহের পুত্র)। শাসনকাল ১৭৪৮-১৭৫৪।

৯) দ্বিতীয় আলমগীর (প্রথম বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহান্দর শাহের পুত্র)। শাসনকাল ১৭৫৪-১৭৫৯।

১০) দ্বিতীয় শাহ আলম (দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র)। ১৭৫৯-১৮০৬।

১১) দ্বিতীয় আকবর (দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্র)। শাসনকাল ১৮০৬-১৮৩৭।

১২) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয় আকবরের পুত্র)। শাসনকাল ১৮৩৭-১৮৫৭। ইংরেজগণ কর্তৃক গদিচ্যুত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৭০৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত, এই ১৫০ বৎসরের মধ্যে যে বারো জন মুঘল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে দশজন অষ্টাদশ শতাব্দীতেই অধিরূঢ় ছিলেন। এই সময়কালটাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এটা বিশেষভাবে ত্বরান্বিত হয় বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর। সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ড চলে, তা মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে রীতিমত দুর্বল করে দিয়েছিল। সেই সুযোগে মারাঠা ও শিখরা সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রবল হয়ে ওঠে। তারপর ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে দিল্লী তছনছ করে দেয়। এটা ঘটে সম্রাট মহম্মদ শাহের শাসনকালে।

দুই

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহ সম্রাট হয়। বাহাদুর শাহের তখন বয়স ৬৯। পাঁচ বছর পরে (১৭১২ খ্রীস্টাব্দে) তার মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর পর মুঘল বংশের রীতি অনুযায়ী সিংহাসনে বসবার অধিকার নিয়ে বংশের সকলেই পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বাহাদুর শাহের দ্বিতীয় পুত্র আজিম-উস্-শান যুদ্ধে নিহত হয়। বাকী তিন ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের পরিণামে জ্যেষ্ঠ জাহান্দার শাহ সম্রাট হয়। কিন্তু এগার মাস শাসনের পরে আমির-ওমরাদের চক্রান্তের ফলে আগরার যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। নিজ মন্ত্রী জুলফিকার খান তাঁকে হত্যা করে। তারপর আজিম-উস্-শানের পুত্র ফারুক-শিয়ার ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যাচারী, অপদার্থ ও নির্লজ্জ লম্পট ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা আবদুল্লা ও হুসেন আলি বারহা সৈয়দ নামে দুই ভাইয়ের হাতে গিয়ে পড়ে। তারা ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে ফারুকশিয়ারকে হত্যা করে। তারপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় কয়েকজন 'ভুতুরে' সম্রাটকে কয়েকদিনের জন্ত করে সিংহাসনে বসায়। (আগে দেখুন)। তারা

অন্তর্হিত হলে ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ শাহ্ সম্রাট হন। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সম্রাট ছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালেই মুঘল সাম্রাজ্য খণ্ডিত হতে থাকে। ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর উজির আসফ জাহ্ দাক্ষিণাত্যে গিয়ে স্বাধীন নিজাম বংশ স্থাপন করে। সেই বছরেই সাদৎ খান অযোধ্যার নবাব বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙলায় আলিবর্দি খান প্রথম প্রথম সম্রাটকে রাজস্ব পাঠাতেন, কিন্তু পরে তা পাঠানো বন্ধ করে দেন এবং স্বাধীন শাসকের ন্যায় আচরণ করতে থাকেন। গঙ্গার উত্তরে রোহিলখণ্ডে রহিলা নামধারী এক আফঘান জাতি নিজ আধিপত্য বিস্তার করে। এ সবই ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর ১৭ বছরের মধ্যে ঘটে যায়। মারাঠা ও শিখরাও আরও প্রবল হয়ে ওঠে। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় পেশওয়া বাজীরাওয়ের আমলে মারাঠারা দিল্লীর উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু আসফ জাহ্ নিজাম দাক্ষিণাত্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে শুনে, মারাঠারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে। তারপর মুঘল সাম্রাজ্যের ওপর চরম আঘাত হানে নাদির শাহ্।

তিন

নাদির শাহকে পারস্যের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে অভিহিত করা হয় ('the greatest warrior Persia has ever produced')। ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহ্ পারস্যের সফবি বংশকে উচ্ছেদ করে পারস্যের সিংহাসন অধিকার করে। সিংহাসনে আরোহণ করবার পর নাদির শাহ সমৃদ্ধশালী ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করবার জন্য নানারকম অছিলা খুঁজতে থাকে। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহ্ গজনি, কাবুল ও লাহোর অতিক্রম করে। বিনা প্রতিরোধে দিল্লীর ৫০ ক্রোশের মধ্যে যমুনা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানেই তাকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। পানিপথের নিকট কর্নালে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা ধরে তার ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মুঘল বাহিনী পরাজিত হয়। বিশ হাজার মুঘল সৈন্য নিহত হয়। নাদির শাহের লোকেরা প্রচুর ধনদৌলত লুণ্ঠন করে। সম্রাট মহম্মদ শাহ্ প্রতিকূল অবস্থা দেখে, নিজেই নাদির শাহের সঙ্গে তার শিবিরে দেখা করতে যান। তারপর দুই সম্রাট একসঙ্গে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। কিছু-দিন বেশ সদ্ভাবে কাটে। কিন্তু নাদির শাহের মৃত্যু ঘটেছে, এরকম একটা রটায়, দিল্লীর নাগরিকরা খড়্গহস্ত হয়ে নাদির শাহের কয়েক শত

সৈনিককে নিহত করে। নাদির শাহ এর ভীষণ প্রতিহিংসা নেয়। দিল্লীর প্রধান রাজপথের ওপর অবস্থিত রশন-উদ-দৌলার সোনার মসজিদে বসে, তিনি দিল্লীর বাসিন্দাদের হত্যা করবার আদেশ দেন। নয় ঘণ্টা যাবৎ এই হত্যাকাণ্ড চলে, এবং অসংখ্য লোক নিহত হয়। তারপর মহম্মদ শাহের বিনীত প্রার্থনায়, এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়। এর পর দিল্লীর সম্রান্ত ব্যক্তিদের গৃহ থেকে, তাদের তিনশত বৎসরের সঞ্চিত ধনদৌলত লুণ্ঠন করা হয়। ৫৮ দিন ভারতে অবস্থানের পর, নাদির শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে যাবার সময় শাহজাহানের বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনটি সঙ্গে নিয়ে যায়। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মে তারিখে এক সন্ধি হয়। সেই সন্ধির শর্ত অনুযায়ী সিন্ধু নদীর পশ্চিমের সমস্ত অঞ্চল নাদির শাহকে দিয়ে দিতে হয়। এই ভাবে মুঘল সাম্রাজ্য থেকে আফঘানিস্তান বিচ্যুত হয়।

নাদির শাহ মুঘল সাম্রাজ্যকে একেবারে নিঃস্ব ও ভূশায়িত করে দিয়ে যায়। সংহত কেন্দ্রীয় শক্তি বলে আর কিছুই থাকে না। দাক্ষিণাত্যে বিশৃঙ্খলতা প্রকাশ পায়। পশ্চিম ভারতে মারাঠারা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। উত্তর ভারতে শিখরাও আরও শক্তিশালী হয়। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে মারাঠা বর্গীরা বাঙলায় গিয়েও হামলা শুরু করতে সাহস পায়।

মুরশিদকুলি খানের শাসন

অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রধান নায়ক ছিলেন মুরশিদকুলি খান। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে বাঙলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ঢাকা তখন বাঙলা সুবার রাজধানী। সুবেদার আজিম-উস্-শানের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না হওয়ায়, মুরশিদকুলি খান তাঁর দপ্তর ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। মুরশিদকুলি খান বাঙলার রাজস্ব বিভাগের গলদগুলি লক্ষ্য করেন। তিনি দেখেন যে বাঙলা সুবার বেশীর ভাগ অংশই সামরিক জায়গীরদারদের হস্তে ন্যস্ত। যে অংশ সরাসরি সুবেদারের নিয়ন্ত্রণে, তার আয় সুবার সামরিক ও অসামরিক শাসন বিভাগের ব্যয় নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই কারণে বাঙলা সুবা সবসময়েই ঋণে ডুবে থাকত, এবং এই ঋণ পরিশোধ করা হত অন্যান্য সুবার অর্থে। মুরশিদকুলি খান দেখলেন যে বাঙলার রাজস্ব প্রভূত পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে, যদি সমস্ত ভূম্যধিকারীদের সরাসরি দেওয়ানের অধীনস্থ করা হয়। তিনি এই প্রস্তাব ঔরঙ্গজেবের নিকট পেশ করেন। সম্রাট তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

রাজস্ব আদায় ও জমি বিলির সুব্যবস্থা করে, মুরশিদকুলি খান বাঙলা দেশের মালগুজারী বাবদ প্রতি বৎসর এক কোটি টাকা ঔরঙ্গজেবকে পাঠাতে থাকেন। তার মানে সম্রাটকে খুশী করে নিজের পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বাঙলাকে তিনি দোহন করতে শুরু করেছিলেন। বাঙলার রাজস্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ঔরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। এতে বাঙলার সুবেদার আজিম-উস্-শান তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। তিনি মুরশিদকুলি খানকে হত্যার জন্য, আবদুল ওয়াহিদ নামক নগদি অশ্বারোহী বাহিনীর এক সেনাপতির সঙ্গে এক চক্রান্ত করেন। পথিমধ্যে তাঁকে হত্যার জন্য তিনি মুরশিদকুলি খানকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। পথে মুরশিদকুলি খান আক্রান্ত হন। কিন্তু আক্রমণের সময় মুরশিদকুলি খান অসাধারণ সাহস প্রদর্শন করায়, এই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। ঢাকায় পৌঁছে মুরশিদকুলি খান আজিম-উস্-শানকে এই চক্রান্তের স্রষ্টা হিসাবে দোষী করেন ও ছোরা হাতে নিয়ে বলেন—'তুমি যদি আমার প্রাণ নিতে চাও, তা হলে এখানেই তার মীমাংসা হয়ে যাক, নচেৎ তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি যে এরূপ কার্য থেকে তুমি ভবিষ্যতে বিরত থাকবে।' আজিম-উস-শান এ বিষয়ে

নিজেকে নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং আবদুল ওয়াহিদকে ভর্ৎসনা করে তার সৈন্যদলকে রাজকীয় বাহিনী থেকে অপসৃত করেন। তারপর মুরশিদকুলি খান এই ঘটনার এক যথার্থ প্রতিবেদন ঔরঙ্গজেবের কাছে পাঠিয়ে দেন। মুরশিদকুলি খানকে হত্যার চক্রান্তের প্রতিবেদন পেয়ে ঔরঙ্গজেব ক্রোধান্বিত হয়ে আজিম-উস্-শানকে লিখে পাঠান যে মুরশিদকুলি খানের কোন ক্ষতি হলে আজিম-উস্-শান তাঁর পৌত্র বলে রেহাই পাবে না, তিনি যথাযথ শাস্তি দিবেন। এ ছাড়া তিনি আজিম-উস্-শানকে বাঙলা ত্যাগ করে বিহারে এসে বাস করতে আদেশ দেন। এই আদেশের পর আজিম-উস্-শান বাঙলার শাসনভার তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ফারুকশিয়ারের ওপর অর্পণ করে, পাটনায় চলে যান।

দুই

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মুরশিদকুলি খান রাজস্বের পরিমাণ রীতিমত বাড়িয়ে তোলেন, এবং সশরীরে সম্রাটের নিকট হিসাব-নিকাশ দিতে যান। সম্রাট তাঁর কার্যের প্রশংসা করেন। এছাড়া, তিনি তাঁকে সম্মানিতও করেন। মুরশিদকুলি খানকে তিনি বিহার, বাঙলা ও ওড়িশা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানের পদে পুনর্নিযুক্ত করেন। উপরন্তু তাঁকে বাঙলা এবং ওড়িশার ডেপুটি নিজাম পদেও উন্নীত করেন। আজিম-উস্-শান এতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু তাঁর পিতামহের স্বৈরতান্ত্রিক মেজাজের কথা স্মরণ করে, কিছু করতে সাহস করেন না। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেবের সন্তানদের মধ্যে হিন্দুস্থানের মসনদ নিয়ে দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়, এবং তাঁর তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়। মহম্মদ আজিম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আজিম-উস্-শানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে পাটনা থেকে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করতে বলে। এই ঘটনারই কিছু পরে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটে। জাজো নামক স্থানে মহম্মদ আজিমও নিহত হয়।

আজিম-উস্-শান পাটনা থেকে দিল্লীতে আহূত হবার পর মুরশিদকুলি খানই কার্যত বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার শাসক হয়ে দাঁড়ান, যদিও আজিম-উস্-শান তাঁর পুত্র ফারুকশিয়ারকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে নাজিমের গদিতে বসিয়ে গিয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর শাহ (আজিম-উস্-শানের পিতা) যখন দিল্লীর সম্রাট হন, তখন তিনি পুত্র আজিম-উস-শানের প্ররোচনায়

মুরশিদকুলি খানকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান করে পাঠান। কিন্তু বাঙলার নূতন শাসক বিদ্রোহী সেনার হাতে নিহত হওয়ায় সম্রাট দেওয়ান ও ডেপুটি নিজামের পদদ্বয় একত্রিত করে মুরশিদকুলি খানকেই বাঙলার শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দেন। মুরশিদকুলি খান মেদিনীপুর জেলাকে ওড়িশা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাঙলার সঙ্গে যুক্ত করেন, এবং নিজ জামাতা শুজাউদ্দিন মহম্মদ খানকে ওড়িশার ডেপুটি নিজাম পদে অধিষ্ঠিত করেন। দুই হিন্দু ব্রাহ্মণকে তিনি দুই বিশ্বস্ত পদ দেন। তাদের মধ্যে ভূপত রায়কে তিনি ট্রেজারী বা খালসার সচিব ও কিশোর রায়কে তাঁর গোপন সচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু হিন্দু জমিদারদের প্রতি তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত অত্যাচারপূর্ণ ছিল। প্রদেশের রাজস্ব সম্বন্ধে প্রকৃত পরিস্থিতি জানবার জন্য তিনি তাদের বন্দী করেন ও নিজ প্রতিনিধির দ্বারা রাজস্ব আদায় করেন। বাঙলার মাত্র দুজন জমিদার এরূপ ব্যবহার থেকে অব্যাহতি পায়। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে বীরভূমের আফঘান ভূস্বামী আশা-উদ্-দৌলা, -ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হিসাবে যাঁর সুনাম ছিল এবং যিনি তাঁর আদায়ীকৃত খাজনার অর্ধেক অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করতেন। আর অপরজন হচ্ছেন বিষ্ণুপুরের জমিদার, যাঁর জমিদারীর অধিকাংশই অনুর্বর ছিল এবং যিনি ঝাড়খণ্ডের পার্বত্য অঞ্চল থেকে আক্রমণ প্রতিহত করে সরকারকে সাহায্য করতেন। এদের দুজনকে তিনি তাদের জমিদারীতে বহাল রেখেছিলেন এই শর্তে যে তারা নিয়মিতভাবে মুরশিদাবাদের খাজাঞ্চীখানায় রাজস্ব জমা দিবে। এ ছাড়া, মুরশিদকুলি খান বাঙলার সমস্ত জমির নূতন করে জরীপ করেছিলেন (১৭২২)। এই জরীপ 'জমা-ই-কামিল তুমার' নামে পরিচিত। এই জরীপ অনুযায়ী বাঙলা দেশকে ১৩টি চাকলায় ভাগ করা হয়। এই ১৩টি চাকলার অন্তর্ভুক্ত মহাল বা পরগণার সংখ্যা ছিল ১৬৬০ ও রাজস্ব পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা।

তাঁর সময়ে ভুষনার জমিদার সীতারাম রায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। মুরশিদকুলি কয়েকবার তাঁকে দমনের চেষ্টা করেও অক্ষম হন। ফলে তিনি সর্ববিষয়েই স্বাধীন রাজার ন্যায় আচরণ করতে থাকেন। পরে ঐশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে ওঠায় তাঁর রাজ্যে বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব হয়। সেই সুযোগে নবাব সৈন্য তাঁর বাসগ্রাম মহম্মদপুর আক্রমণ করে তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করেন। কিংবদন্তী অনুযায়ী তাঁকে শূলে দেওয়া হয়।

জমিদারদের নিপীড়ন ছাড়া, মুরশিদকুলি খান খুব ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তাঁর বিচার এত পক্ষপাতশূন্য ছিল যে আইনভঙ্গের জন্য তিনি নিজ পুত্রকেও মৃত্যুদণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হননি।

মুরশিদকুলি খানের প্রতাপ ও প্রতিপত্তি দেখে ত্রিপুরা, কুচবিহার ও আসামের রাজারা এমনভাবে সন্ত্রস্ত হয়েছিল যে তাঁরা তাঁকে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতেন, এবং মুরশিদকুলি খান তার পরিবর্তে তাদের প্রতীক-পোষাক উপহার দিতেন, যে পোষাক পরিধান করলে নবাবের আনুগত্য স্বীকার করা হয়। প্রতি বৎসরই এইরূপ উপঢৌকন ও উপহার বিনিময় করা হত।

তিন

এই সময় হুগলীর ফৌজদার বাঙলার দেওয়ান ও নাজিম থেকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল। কিন্তু একই রাজ্যের মধ্যে অন্য এক দ্বিতীয় শাসক থাকা অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করে, মুরশিদকুলি খান সম্রাটের কাছ থেকে অনুমতি সংগ্রহ করেন যে ওই পদে তিনি নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন। সেই অনুসারে তিনি ওয়ালি বেগ নামে এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। অপসৃত ফৌজদার জিয়ুদ্দিন শান্তভাবেই প্রস্থান করবার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু ওয়ালি বেগ যখন অপসৃত ফৌজদারের পেশকার কিঙ্কর সেনকে হিসাবপত্র বুঝিয়ে দেবার জন্য আটক করে, তখন অপসৃত ফৌজদার জিয়ুদ্দিন এর প্রতিবাদ করে এবং তার ফলে সংঘর্ষ হয়। জিয়ুদ্দিন চুঁচুড়ায় অবস্থিত ওলন্দাজদের ও চন্দ্রনগরে অবস্থিত ফরাসীদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। মুরশিদকুলি খান তখন ওয়ালি বেগের সাহায্যার্থে দলপত সিং নামে এক ব্যক্তির অধীনে সৈন্য প্রেরণ করেন। দলপত সিং চন্দ্রনগরের কাছে শিবির স্থাপন করে। কিন্তু কোনরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। কিছুদিন পরে জিয়ুদ্দিন সন্ধি স্থাপনের জন্য দলপত সিং-এর কাছে এক দূত প্রেরণ করে। ওই দূতের সঙ্গে দলপত সিং যখন কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় এক ফরাসী গোলন্দাজ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত গোলা এসে তাঁর ওপর পড়ে, এবং তিনি নিহত হন। দলপত সিং-এর মৃত্যুর পর নবাবের সৈন্যবাহিনী কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে হুগলীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এর পর জিয়ুদ্দিন শান্তভাবে দিল্লীতে চলে যায়। নবাব কিঙ্কর সেনকে ক্ষমা করেন এবং তাঁকে হুগলী জেলায় রাজস্ব আদায়কারীর পদে

নিযুক্ত করেন। কিন্তু পরে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আসায়, তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। এর অল্পদিন পরে কারাগারেই তার মৃত্যু হয়।

রাজস্ব আদায় ব্যাপারে মুরশিদকুলি খানের নীতি কঠোরতার চূড়ান্ত ছিল। এ বিষয়ে তাঁর নিযুক্ত লোকেরা নানাবিধ অমানুষিক শাস্তি ও পীড়ন দ্বারা রাজস্ব আদায় করত, যেমন মাথা নীচের দিকে করে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা কিংবা শীতকালে উলঙ্গ করে গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া, বগলের তলা দিয়ে দড়ি বেঁধে পচা পুকুরের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কখনও কখনও তাদের ঢাউস ইজের পরিয়ে তার ভিতর জ্যান্ত বিড়াল ছেড়ে দিত। এরূপ উৎপীড়ন ও অত্যাচার দ্বারা জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হত। এবং প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ৩০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতিক সৈন্য সমভি-ব্যাহারে দিল্লীতে সম্রাটের নিকট এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাঠানো হত। এর ফলে গোটা দেশ করভারে পীড়িত হয়ে পড়েছিল।

চার

আমরা আগেই বলেছি যে আজিম-উস্‌-শান যখন দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন তিনি তাঁর পুত্র ফারুকশিয়ারকে বাঙলা ও ওড়িশার মসনদে তাঁর প্রতিভু হিসাবে বসিয়ে গিয়েছিলেন। যদিও মুরশিদকুলি খানই বাঙলায় কার্যত শাসক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তা হলেও ফারুকশিয়ার মুরশিদকুলি খানের সঙ্গে সম্ভাবই রেখেছিলেন। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহের মৃত্যুর (১৭১২) পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাহান্দর শাহ যখন নিজ ভ্রাতা আজিম-উস্‌-শানকে হত্যা করে সম্রাট হন, ফারুকশিয়ার তখন পিতার মৃত্যুর প্রতিহিংসা নেবার জন্য মুরশিদকুলি খানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুরশিদকুলি খান দিল্লীর সম্রাটের আনুগত্য পরিহার করতে অস্বীকার করেন। তখন ফারুকশিয়ার পাটনায় গিয়ে, আজিম-উস্‌-শান কর্তৃক অধিষ্ঠিত বিহারের শাসক সৈয়দ হুসেন আলি খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুসেন আলি প্রথমে ইতস্তত করেন, কিন্তু যখন ফারুকশিয়ারের পরিবারের মেয়েরা গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করল, তখন তিনি ফারুকশিয়ারকে সাহায্য করতে সম্মত হন। আলাহাবাদের শাসক সৈয়দ আবদুল্লা খানকেও আজিম-উস্‌-শানই তাঁর পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। আবদুল্লা খান সৈয়দ-হুসেন আলি খানেরই ভ্রাতা। দুই ভাই একত্রিত হয়ে ফারুকশিয়ারকে সাহায্য করতে

প্রবৃত্ত হয়। দিল্লী অভিগামী রাজস্ব তারা লুঠ করে এবং পাটনা ও বারাণসীর ব্যাঙ্কারদের কাছ থেকে টাকা ধার করে, তারা এক সৈন্যবাহিনী গঠিত করে। কাঠগয়া নামক স্থানে তারা জাহান্দর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র আজিউদ্দিনকে যুদ্ধে পরাজিত করে (১৭১২)। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক পরিচালিত সৈন্যবাহিনীকেও ফারুকশিয়ারের সৈন্যদল আগরায় পরাজিত করে। সম্রাট পালিয়ে গিয়ে তাঁর উজির আসাদ-উদ-দৌলার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু আসাদ-উদ-দৌলা বিশ্বাসঘাতকতা করে সম্রাটকে ফারুকশিয়ারের হাতে সমর্পণ করে। ফারুকশিয়ার সম্রাটকে হত্যা করে। এইভাবে ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে ফারুক-শিয়ার হিন্দুস্থানের সম্রাট হন।

পাঁচ

এই ঘটনার এক বৎসর পূর্বে ফারুকশিয়ার যখন পাটনাতে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি কিছু প্ররোচনার বশীভূত হয়ে রশিদ খান নামক এক ব্যক্তিকে বাঙলার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মুরশিদকুলি খান রশিদ খানকে মুরশিদাবাদের নিকট প্রতিরোধ করেন। রশিদ খানের সঙ্গে মুরশিদকুলি খানের যে সংঘর্ষ হয়, সেই সংঘর্ষে রশিদ খান নিজ অশ্ব থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। কিন্তু ফারুকশিয়ার যখন হিন্দুস্থানের সম্রাট হন (১৭১৩) মুরশিদকুলি খান তখন নিজ কূটবুদ্ধি অনুযায়ী সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁকে বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠান। ফারুকশিয়ারও মুরশিদকুলি খানকে বাঙলা ও ওড়িশার সুবেদার নিযুক্ত করেন। তখন মুরশিদকুলি খান মুকসুদাবাদের নাম পরিবর্তন করে মুরশিদাবাদ রাখেন (১৭১৩ খ্রীস্টাব্দ)।

এইভাবে শক্তিমান হবার পর মুরশিদকুলি খান ইংরেজদের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্ত হন। শাহজাদা শুজার কাছ থেকে ইংরেজরা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল, সেগুলি তিনি বাতিল করে দেন। বার্ষিক তিন হাজার টাকা প্রদানের পরিবর্তে ইংরেজরা অবাধ বাণিজ্যের যে অধিকার পেয়েছিল, তাও নাকচ করে তিনি আদেশ দেন যে হিন্দুরা যে বাণিজ্য শুল্ক দেয়, ইংরেজদেরও তা পুরামাত্রায় দিতে হবে। নবাবের এরূপ আচরণে বিব্রত হয়ে ইংরেজরা দিল্লীতে সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করে। ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি

জন সুরম্যান ও এডওয়ার্ড ষ্টিভেনসন নামে দুই ব্যক্তিকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করে সরাসরি দিল্লীতে বাদশাহ ফারুকশিয়ারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে যায় দোভাষী হিসাবে খোজা সারহাউদ ও চিকিৎসক হিসাবে ক্যাপটেন উইলিয়াম হ্যামিলটন। তারা সঙ্গে করে নিয়ে যায় বহুমূল্য উপঢৌকন। মুরশিদকুলি খান দূতদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এক আকস্মিক ঘটনা ইংরেজদের সহায়ক হয় এবং তারা সম্রাটের কাছ থেকে সহানুভূতিশীল ব্যবহার পায়। ঘটনাটা আর কিছুই নয়, সম্রাটের অণ্ডকোষের এক কঠিন পীড়া। ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ ফারুকশিয়ারের আদেশে হুসেন আলি খান নামক সেনাপতির অধীনে মোগল বাহিনী যোধপুর আক্রমণ করে। যোধপুরের রাজা অজিত সিং পরাহত হয় এবং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী অজিত সিং তার মেয়ের সঙ্গে বাদশাহের বিবাহ দিতে রাজী হয়। কিন্তু সম্রাট হঠাৎ পীড়িত হওয়ায়, এই বিবাহে বিঘ্ন ঘটে। এই মুহূর্তেই ইংরেজ কোম্পানির দূতগণ দিল্লীতে গিয়ে হাজির হয়। ইংরেজ দূতগণের সঙ্গে আগত চিকিৎসক ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিলটন সম্রাটকে পীড়ামুক্ত করে। এভাবে তার বিবাহের পথ প্রশস্ত হয়। সম্রাট খুশী হয়ে ইংরেজদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ও তাদের ফারমান দেন। ইংরেজদের প্রার্থনা ছিল—(১) কলকাতার প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র প্রদর্শন করলে, নবাবের কোন কর্মচারী নৌপথে আগত ইংরেজদের কোন মাল আটক বা পরীক্ষা করতে পারবে না, (২) সপ্তাহে তিনদিন মুরশিদাবাদের টাঁকশালে ইংরেজদের মুদ্রা নির্মাণের অধিকার থাকবে, (৩) ইংরেজরা অনুরোধ করা মাত্র ইংরেজদের কাছে ঋণী এরকম ব্যক্তিকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করতে হবে, এবং (৪) কলকাতার সংলগ্ন ৩৮ খানা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব তারা কিনতে পারবে। ফারমান দ্বারা সম্রাট ইংরেজদের এ সকল প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। মুরশিদকুলি খান সম্রাটের আদেশ অমান্য করতে সাহস করলেন না। কিন্তু ৩৮ খানা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কেনা সম্বন্ধে তিনি স্থানীয় জমিদারদের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করলেন যে সে সম্পর্কে ইংরেজদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফারুকশিয়ার মুরশিদকুলি খানকে বিহারেরও শাসক নিযুক্ত করেন। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে ফারুকশিয়ারের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর সাত মাসের মধ্যে পর পর দুজন সম্রাট হন; তারপর ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ শাহ দিল্লীর বাদশাহ হন। তিনিও মুরশিদকুলি খানকে বাঙলা, বিহার ও

ওড়িশার শাসক পদে বহাল রাখেন। কিন্তু মুরশিদকুলি খান দিল্লীর সঙ্গে নামমাত্র সম্পর্ক রেখে নিজেই স্বাধীন শাসক হয়ে ওঠেন। এভাবে তিনি বাঙলায় নবাবী আমলের সূচনা করেন। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে মুরশিদকুলি খানের মৃত্যু ঘটে।

মুরশিদকুলি খান যোগ্য শাসক হলেও, দেশের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে পারেন নি। তাঁর হিন্দুবিদ্বেষ এবং জমিদার ও প্রজাদের পীড়ন করে অর্থসংগ্রহ করার ফলে দেশে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। অর্থনৈতিক শোষণে বাঙলা ক্রমশ জীর্ণ হতে আরম্ভ হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় দেশের লোকের দুর্দশার সীমা থাকত না। পরবর্তী শাসকদের সময় এই অবস্থাই চলেছিল। মোটকথা, গোটা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই বাঙালী সমাজে দৈন্যতা করেছে মুখব্যাদান। বৎসরের পর বৎসর দিল্লীতে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব প্রেরণের ফলে বাঙলায় রৌপ্য মুদ্রার অভাব ঘটেছিল, যার পরিণতিতে কেনাবেচা ও লেনদেন প্রাচীন প্রথানুযায়ী কড়ির মাধ্যমেই হওয়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। পলাশী যুদ্ধের সময় পর্যন্ত এই অবস্থা বহাল থাকে।

আলিবর্দি খান ও বর্গীর হাঙ্গামা

তাঁর মৃত্যুর পূর্বে মুরশিদকুলি খান তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে বাঙলার নবাব মনোনীত করে যান। কিন্তু সরফরাজ খানের পিতা শুজাউদ্দিন নিজেই পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ান। আমলারা চক্রান্ত করে পিতা শুজাউদ্দিনকেই বাঙলার নবাব করে। তবে তিনি নবাব হবার পর পুত্র সরফরাজ খানকে দেওয়ান পদে অভিষিক্ত করেন। নবাবের গদিতে উপবিষ্ট হয়েই শুজাউদ্দিন মুরশিদকুলি খান কর্তৃক কারারুদ্ধ বাঙলার জমিদারদের মুক্তি দেন। নিজ বন্ধু-বান্ধব অনেককে তিনি রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। দেশশাসন বিষয়ে তিনি নিকট আত্মীয় হাজি আহম্মদ ও আলিবর্দি খান ও রায়রায়ন আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রমুখদের উপদেশ অনুসরণ করেন। সম্রাটের সঙ্গে তিনি অটল আনুগত্যসম্পন্ন সম্পর্ক রাখেন। দিল্লীতে নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রেরণ ছাড়া, বহু অর্থ ও উপঢৌকন সম্রাটকে (মহম্মদ শাহকে) পাঠাতেন। তিনি নিজ সৈন্যবল বৃদ্ধি করেছিলেন এবং পুনরায় বিহার অধিকার করে সেখানে তাঁর প্রতিভূ হিসাবে আলিবর্দি খানকে নিযুক্ত করেন।

১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে শুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাঙলার নবাব হন। তিনি বিলাসী, আরামপ্রিয় ও অপদার্থ ব্যক্তি ছিলেন। যদিও বাহ্যতঃ তিনি দিল্লীর সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতেন, তা হলেও ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে যখন নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে দিল্লীতে প্রবেশ করে, সম্রাট তখন তার কাছ থেকে বিগত তিন বছরের রাজস্ব চেয়ে পাঠান। তখন সরফরাজ খান যে মাত্র রাজস্ব পাঠিয়ে দিলেন না তা নয়, নাদির শাহের নামে মুদ্রা নির্মাণ করবারও আদেশ দিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও দেশশাসন বিষয়ে হাজি আহম্মদ, রায়রায়ন আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতেন। কিন্তু পরে তাঁদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। তখন তারা এক চক্রান্ত করে, তাকে গদিচ্যুত করে বাঙলার মসনদে আলিবর্দি খানকে বসাবার জন্য গোপনে সম্রাট মহম্মদ শাহের কাছ থেকে এক মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করে। ফলে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দি খান গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খানকে পরাজিত করে বাঙলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন।

দুই

আলিবর্দি খানের প্রকৃত নাম মীর্জা মহম্মদ আলি। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন আরবদেশীয় লোক। পিতামহ ঔরঙ্গজেবের মনসবদার ছিলেন। পিতা ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজম শাহের রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করতেন। মা ছিলেন তুর্কদেশীয় রমণী। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে তাঁর পুত্রদের যে যুদ্ধ হয়, আজম শাহ তাতে নিহত হন। আলিবর্দি খান তখন দিল্লী থেকে বাঙলায় আসেন চাকুরীর সন্ধানে। কিন্তু মুরশিদকুলি খান তাঁকে পছন্দ না করায়, ওড়িশার নায়েব নাজিম শুজাউদ্দিনের (মুরশিদকুলি খানের জামাতা) কাছে যান। রাজকার্যে তাঁর প্রখর বুদ্ধি দেখে শুজাউদ্দিন তাঁকে একটি জেলার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। মুরশিদকুলি খানের মৃত্যুর পর, আলিবর্দি খান কৌশলে, পুত্র সরফরাজ খানের পরিবর্তে পিতা শুজাউদ্দিনকে বাঙলার সিংহাসনে বসান। এই উপকারের জন্য শুজাউদ্দিন তাঁকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পরে ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে বিহার যখন বাঙলার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন আলিবর্দি খান বিহারের নায়েব নিজামের পদে উন্নীত হন। তার পরের ঘটনা পূর্ব অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

মসনদে বসেই আলিবর্দি খান আর কালক্ষেপণ না করে, প্রাক্তন নবাবের কোষাগার দখল করে নেন এবং প্রাপ্ত ধন থেকে এক কোটি টাকা নগদ ও ৭০ লক্ষ টাকার বহুমূল্য রত্নাদি, থালাবাসন ও রেশম বস্ত্রাদি দিল্লীতে সম্রাট মহম্মদ শাহকে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। মহম্মদ শাহ সঙ্গে সঙ্গেই বিহার, বাঙলা ও ওড়িশা, এই তিন প্রদেশের শাসক হিসাবে তাঁকে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ কিছুদিন পরে মহম্মদ শাহ আলিবর্দি খান কর্তৃক প্রেরিত উপঢৌকনে অসন্তুষ্ট হয়ে, প্রাক্তন নবাবের সমস্ত ধনরত্ন ও দু'বৎসরের বকেয়া রাজস্ব মুরাদ খান নামক একজন কর্মচারী মারফৎ চেয়ে পাঠান। কিন্তু আলিবর্দি খান রাজমহলে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে একটা মোটা অঙ্কের উৎকোচ দেওয়ায়, মুরাদ খান মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা ও ৭০ লক্ষ টাকার ধনরত্নাদি ও কিছুসংখ্যক হস্তী ও অশ্ব গ্রহণ করে বকেয়া রাজস্ব সম্বন্ধে কোন মীমাংসা না করে দিল্লীতে ফিরে যায়। পরে আলিবর্দি খান দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করেন ও বাঙলায় স্বাধীন শাসক হিসাবে আচরণ করেন।

আলিবর্দি খান শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন ও ঢাকার সঙ্গে তা

সংযুক্ত করে, ঢাকার শাসনভার তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নুয়াজিশ মহম্মদের ওপর অর্পণ করেন। কনিষ্ঠ জামাতা জিমুদ্দিনের ওপর তিনি বিহারের শাসনভার অর্পণ করেন। আর ওড়িশার শাসন থেকে তিনি শুজাউদ্দিনের জামাতা রুস্তম জঙ্গকে অপসারণ করে তার শাসনভার নিজ মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদের ওপর অর্পণ করতে চান। কিন্তু রুস্তম জঙ্গ বিরোধিতা করায়, আলিবর্দি খানের সৈন্যবাহিনী রুস্তম জঙ্গের বিরুদ্ধে যাত্রা করে দীর্ঘদিন লড়াইয়ের পর তাকে পরাজিত করে। পরাজিত হয়ে রুস্তম জঙ্গ মসুলিপটনমের ফৌজদার আনওয়ার উদ্দিনের কাছে পালিয়ে যায় ও আশ্রয়লাভ করে। এর পর আলিবর্দি খান নিজ মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহম্মদকে ওড়িশার শাসনভার দেন। কিন্তু তার অত্যাচারে পীড়িত হয়ে ওড়িশার জনগণ রুস্তমকে ওড়িশায় প্রত্যাবর্তন করতে আমন্ত্রণ জানায়। জীবনের অবশিষ্টাংশ তিনি অবসরে কাটাবেন সিদ্ধান্ত করায়, ওড়িশার জনগণ তখন তাঁর এক প্রাক্তন কর্মচারী বৌকির খানকে ওড়িশার শাসনভার গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায়। এক গোপন কৌশলে তিনি সৈয়দ আহম্মদকে বন্দী করেন এবং ওড়িশার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই আলিবর্দি খানের নেতৃত্বে এক বাহিনী এসে তার প্রতিরোধ করায়, তিনি ওড়িশা থেকে পালিয়ে যান।

তিন

তাঁর ওড়িশা অভিযান থেকে ফেরবার পথে মেদিনীপুরে এসে আলিবর্দি খান শুনলেন যে বেরারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সমেত ভাস্কর পণ্ডিত নামে এক ব্যক্তিকে বাঙলায় পাঠিয়েছেন চৌথ আদায় করবার জন্য। আলিবর্দি খানের ইচ্ছা ছিল যে তিনি রাজধানী মুরশিদাবাদে ফিরে মারাঠাদের প্রতিরোধ করবেন। কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না, কেননা মারাঠারা ইত্যবসরেই ওড়িশার ভিতর দিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। বিভিন্ন স্থানের যুদ্ধে বাঙলার সৈন্যবাহিনী অসীম বীরত্বের সঙ্গে মারাঠাদের প্রতিহত করেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া মারাঠাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তরবারীর জোরে গ্রামসকল লুণ্ঠন করা। চতুর্দিকেই এতে এক সন্ত্রাস পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাঙলার লোক একে 'বর্গীর হাঙ্গামা' আখ্যা দেয়। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে এই হাঙ্গামা শুরু হয়, এবং প্রায় ন'বছর ধরে এই

হাঙ্গামা চলে। সমসাময়িক তিনখানা বইয়ে আমরা বর্গীর হাঙ্গামার এক ভীতিপ্রদ চিত্র পাই। এই তিনখানা বইয়ের মধ্যে একখানা হচ্ছে গুপ্তপল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থ। তিনি প্রথমে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোন কারণে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর ওপর রুষ্ট হলে তিনি বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান এবং তাঁর আদেশেই গদ্যেপদ্যে 'চিত্রচম্পূ' গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানির রচনাকাল ১৭৪৪। সুতরাং বইখানা বর্গীর হাঙ্গামার সমসাময়িক। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের পুস্তকাগারে (এখন এই পুস্তকাগারের নাম পরিবর্তিত হয়েছে) এই গ্রন্থের একখানা পুঁথি আছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—'বর্গীদিগের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বাঙলার লোক বড়ই বিপন্ন ও ব্যাকুল হয়ে পড়ে। শকটে, শিবিকায়, উষ্ট্রে, অশ্বে, নৌকায় ও পদব্রজে সকলে পালাতে আরম্ভ করে। পলায়মান ব্রাহ্মণগণের স্কন্ধোপরি 'লম্বালক' শিশু, গলদেশে দোদুল্যমান আরাধ্য শালগ্রামশিলা, মনের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 'দুর্বহ মহাভার' সঞ্চিত শাস্ত্রগ্রন্থরাশির বিনাশের আশঙ্কা, গর্ভভারালস পলায়মান রমণীগণের নিদাঘ সূর্যের অসহনীয় তাপক্লেশ, যথাসময় পানাহারলাভে বঞ্চিত ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল শিশুগণের করুণ চীৎকারে ব্যথিত জননীগণের আর্তনাদ ও অসহ্য বেদনায় সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত।' আর একখানা গ্রন্থ হচ্ছে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'। এখানা রচনা করেছিলেন কবি গঙ্গারাম দাস, ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ। 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'-এ বর্ণিত হয়েছে—'কারু হাত কাটে কারু নাক কান। একই চোটে কারু বধে পরাণ॥ ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত লইয়া জা এ। অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলা-এ॥ একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে। রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥' বর্গীর হাঙ্গামাকে লক্ষ্য করে ভারতচন্দ্রও (১৭১২-১৭৬০) তাঁর 'অন্নদামঙ্গল'-এ (১৭৫২-৫৩) লিখেছেন—'লুঠি বাংলার লোক করিল কাঙ্গাল। গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল॥ কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি। লুঠিয়া লইল ধন ঝিউরী বহুড়ী॥'

সাধারণ লোকের মনে বর্গীর হাঙ্গামা এমন এক উৎকট ভীতি জাগিয়েছিল যে তা পরবর্তীকালে বাঙলার মেয়েদের মুখে ছেলেদের ঘুম পাড়ানো গানে প্রতিধ্বনিত হত।

বর্গীরা ভাগীরথী অতিক্রম করে মুরশিদাবাদ শহর লুটপাট করে। জগৎশেঠের

বাড়ী থেকে অনেক টাকা সংগ্রহ করে। ইংরেজদের কয়েকটা নৌকাও বর্গীরা লুটপাট করে। কলকাতার লোক ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কাঠের রক্ষাবেষ্টনী থাকা সত্ত্বেও ভীতিগ্রস্ত হয়ে ইংরেজরা শহর সুরক্ষিত করবার জন্য দেশীয় বণিকদের সহায়তায় গঙ্গার দিক ছাড়া শহরের চারদিক ঘিরে 'মারাঠা ডিচ' খুঁড়তে আরম্ভ করে।

আলিবর্দি খান যখন ওড়িশা অভিযান থেকে ফিরছিলেন তখন বর্ধমান শহরে রাণীদীঘির কাছে বর্গীরা তাঁর শিবির অবরোধ করে। নবাব অতি কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। আলিবর্দি খান যখন মুরশিদাবাদে আসেন, বর্গীরা তখন কাটোয়ায় পালিয়ে যায়। পূজার সময় বর্গীরা কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটায় দুর্গাপূজা করে। কিন্তু ওই পূজা অসমাপ্ত থাকে, কেননা নবমীর দিন আলিবর্দি খান অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের তাড়িয়ে দেন। তারপর বালেশ্বরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মারাঠারা চিলকা হ্রদের দক্ষিণে পালিয়ে যায়।

পরের বছর (১৭৪৩) রঘুজী ভোঁসলে নিজে বাঙলা দেশ আক্রমণ করেন। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনুরোধে পেশওয়া বালাজী বাজীরাও বাঙলাদেশ থেকে বর্গীদের তাড়িয়ে দিতে সম্মত হন। আলিবর্দি খান স্বীকার করেন যে তিনি মারাঠারাজা শাহুকে বাঙলাদেশের চৌথ এবং পেশওয়াকে যুদ্ধের খরচ বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিবেন। পেশওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রঘুজী ভোঁসলে পালিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল হল না। বর্গীরা প্রতি বছরই বাঙলা দেশে এসে উৎপাত করতে লাগল। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দি খান ভাস্কর পণ্ডিত ও তার সেনাপতিদের সন্ধির অছিলায় মুরশিদাবাদের কাছে মানকরা নামক স্থানে নিজ শিবিরে আমন্ত্রণ করে হত্যা করেন। এই ঘটনার পর বর্গীরা বছর খানেক হাঙ্গামা বন্ধ রাখে। কিন্তু তারপর হাঙ্গামা আবার শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আলিবর্দি খান বর্গীদের সঙ্গে আর পেরে ওঠেন নি, এবং সন্ধি করতে বাধ্য হন। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী আলিবর্দি খান ওড়িশা বর্গীদের হাতে তুলে দেন। মারাঠারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারা ওড়িশা থেকে সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করে বাঙলাদেশে আর ঢুকবে না। জলেশ্বরের কাছে সুবর্ণরেখার পূর্বতীর পর্যন্ত আলিবর্দি খানের রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হয়। আলিবর্দি খান প্রতি বৎসর বাঙলাদেশের চৌথ হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতিও দেন।

বর্গীর হাঙ্গামা নিয়ে বাঙলাদেশে অনেক কিংবদন্তীর সৃষ্টি হয়েছিল। বীরভূমের বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক কিংবদন্তী আছে যে এক যোগিনীসিদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দচন্দ্র গোস্বামী (যাকে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার ভাবেন) অলৌকিক শক্তিবলে বর্গীর হাঙ্গামা দমন করেছিলেন। আনাসহিদ নামে একজন পীর সাহেবও বর্গীদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা যান। বীরভূমের রামপুরহাটের নিকট নলহাটিতে এক পাহাড়ের ওপর তাঁর স্মৃতি-সমাধি বর্তমান।

মুরশিদকুলি খানের ন্যায় আলিবর্দি খান যোগ্য শাসক হলেও, দেশ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথেই এগিয়ে গিয়েছিল। বর্গীর হাঙ্গামার ফলে দেশের এক বিশাল অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়েছিল। বহুস্থানে কৃষিভূমি ও লোকালয় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। বিবেচক শাসক হলেও আলিবর্দি খান বর্গীদের বাধা দেবার প্রয়োজনে দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের করভারে জর্জরিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দি খান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা (আলিবর্দি খানের কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জিনুউদ্দিনের বিবাহ হয়েছিল) জিনুউদ্দিনের পুত্র মিরজা মহম্মদ (ওরফে সিরাজদ্দৌলা)-কে নবাব পদে মনোনীত করে যান।

সুদর্শন এই যুবক তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও অসচ্চরিত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে একবার তিনি গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহারের সময় নৌকা থেকে নাটোরের রাণী ভবানীর বালবিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে ছাদের ওপর চুল শুকাবার সময় দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁর হারেমে তাঁর কন্যাকে পাঠাবার জন্য রাণী ভবানীকে আদেশ দেন। রাণী ভবানী রাতারাতি কন্যাকে এক সাধুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের মানসম্ভ্রম রক্ষা করেন। আলিবর্দি খান জীবিত থাকাকালীনই সিরাজের নিষ্ঠুর ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণে তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। ঢাকার শাসক তাঁর জ্যেষ্ঠ মেসো নুয়াজিশ মহম্মদের শক্তি খর্ব করবার জন্য সিরাজ হুসেনউদ্দিন ও হুসেনকুলি খান নামক নুয়া-জিশের দুই প্রতিভূকে হত্যা করে। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে মুরশিদাবাদে নুয়াজিশের মৃত্যু ঘটে এবং সেই বৎসর আলিবর্দি খানও মারা যান। বাঙলার মসনদে আরোহণ করেই সিরাজ নুয়াজিশের সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করে ও তাঁর বিধবা ঘাসিতি বেগমকে (সিরাজের মাসী) তার মতিঝিলের প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেয়। ঢাকার উপশাসক রাজবল্লভের কাছ থেকে তিনি অনেক টাকা চেয়ে পাঠান। রাজবল্লভ ভীত হয়ে তাঁর পুত্র কৃষ্ণবল্লভ ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর সমস্ত ধনরত্নাদি সমেত কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। সিরাজ তাঁর দুই সাথী মোহনলাল ও মীরমদনকে যথাক্রমে দেওয়ান ও সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। মীরজাফর খান (আলিবর্দি খানের বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ খানের স্বামী)-কেও তিনি তার পদ থেকে অপসৃত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মীরজাফর পূর্ণিয়ার শাসক শৌকত জঙ্গের সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লীতে গিয়ে সম্রাটের দরবারে প্রভাব সঞ্চয় করে একখানা আদেশনামা সংগ্রহ করে, যার দ্বারা শৌকত জঙ্গকে বাঙলার শাসক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সিরাজ আগে থাকতে সংবাদ পেয়ে শৌকত জঙ্গের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্ণিয়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু পূর্ণিয়া পর্যন্ত তার যাওয়া হয় না, কেননা, রাজমহলে পৌছে সিরাজ খবর পান যে ইংরেজরা কলকাতা দুর্গে শক্তি সঞ্চয় করছে ও দুর্গ সুদৃঢ় করছে। সিরাজ কাশিমবাজারে ফিরে এসেই ইংরেজ-দের কাশিমবাজারের কুঠি লুণ্ঠন ও অধিকার করেন। এছাড়া, তিনি কাশিম-

বাজারে অবস্থিত ইংরেজ বণিকদের বন্দী করেন। এই বন্দীদের মধ্যে তরুণ বয়স্ক ওয়ারেন হেষ্টিংসও ছিলেন। তখন তিনি কাশিমবাজারের কুঠিতে করণিকের কাজ করতেন। কিন্তু কাশিমবাজারে অবস্থিত ফরাসী ও ওলন্দাজদের মধ্যস্থতায়, এবং তারা ইংরেজদের হয়ে জামিন দেওয়ায় সিরাজ বন্দী ইংরেজ বণিকদের মুক্তি দেয়। তখন তারা কলকাতায় এসে কর্তৃপক্ষকে সমস্ত খবর দেয়।

দুই

আলিবর্দি খান মারা যাবার পর থেকেই সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ঘটেছিল। বিরোধের কারণ আলিবর্দি খান জীবিত থাকা কালে ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠিতে তাঁকে প্রবেশ করতে না দেওয়া, তাঁর অভিষেককালে প্রথা-অনুযায়ী ইংরেজরা তাঁকে উপঢৌকন পাঠিয়ে অভিনন্দন না করা, রাজবল্লভের বিরুদ্ধে অভিযোগকালে ইংরেজ কর্তৃক তাঁর পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয়দান, বাণিজ্য সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার করা ও নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে কলকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করবার প্রয়াস।

কাশিমবাজার কুঠির অবরুদ্ধ ইংরেজরা মুক্তি পেয়ে, কলকাতায় এসে যখন খবর দেয়, ইংরেজরা তখন একটু শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বহুদিন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকার দরুণ তারা উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া, বহুদিন সংস্কারের অভাবে দুর্গটাও অভেদ্য ছিল না। তারপর দুর্গটা ছিল বসতি এলাকার মধ্যে। আশেপাশে ইংরেজ ও এদেশীয় লোকদের অনেক ঘরবাড়ী ছিল। দুর্গপাড়ার মধ্যে বহুসংখ্যক পর্তুগীজও ছিল। সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণের তোড়জোড় করেন, তখন পর্তুগীজরা এসে আশ্রয় প্রার্থনা করল দুর্গের ভিতরে। দুর্গ-রক্ষণে তারা সহায়ক হবে ভেবে ইংরেজরা তাদের আশ্রয় দিল। কিন্তু পর্তুগীজরা তখন চারিত্রিক অবনতির চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সেজন্য তারা কোন কাজেই লাগল না। বরং কাজের সময়ে দুর্গসংরক্ষণের পক্ষে একটা ঘোরতর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এছাড়া ইংরেজরা দুর্গরক্ষার জন্য যে ১৫০০ বন্দুকধারী হিন্দু সৈনিক নিযুক্ত করেছিল, যুদ্ধের সময় তারাও পালিয়ে গেল।

তিন

সিরাজ কলকাতায় আসছে শুনে ইংরেজরা কলকাতাকে সুরক্ষিত করবার চেষ্টা করল। তিনটা তোপমঞ্চ বা ব্যাটারি স্থাপিত হল। তার মধ্যে একটা বাগবাজারে পেরিংস পয়েণ্টে। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জুন তারিখে সিরাজ যখন কলকাতার সামনে এসে হাজির হলেন, তখন এখানেই নবাববাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম সংঘর্ষ হল। ইংরেজরা নবাববাহিনীকে আটকাতে পারল না। নবাববাহিনী দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। নবাবের বাহিনীতে ছিল ৫০,০০০ পদাতিক ও বিস্তর গোলন্দাজ। তারা আসবার পথে দুধারের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিল। সেগুলো লুণ্ঠন করল। বড়বাজার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করল। ভয়ে কলকাতার লোক শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল। নবাববাহিনী কর্তৃক ইংরেজরা তিন দিক থেকে আক্রান্ত হল। একমাত্র ভাগীরথীর দিকটাই ইংরেজদের পক্ষে মুক্ত ছিল। মাত্র ৫০০ সৈনিক (তাদের মধ্যে শিক্ষিত সৈনিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭০) নিয়ে ইংরেজরা পাঁচ দিন ধরে দুর্গ রক্ষা করবার চেষ্টা করল। তারপর যখন দেখল দুর্গ রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না, তখন নারী ও শিশুদের ভাগীরথীর বক্ষে অবস্থিত জাহাজসমূহে পাঠিয়ে দিল। দুর্গের সান্নিধ্যে তারা আরও জাহাজ রেখেছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল যে দুর্গের পতন যখন একান্ত অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে তখন তারা দুর্গের পিছনের দ্বার দিয়ে জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নেবে। কিন্তু দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণ এমনই ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে তারা আগে থাকতেই জাহাজে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে ঘোষণা করে দিল যে 'সব খতম্'। এই ঘোষণার পর ১৯ জুন তারিখের ভাঁটার স্রোতে জাহাজগুলো কলকাতা ত্যাগ করল। পলাতক ইংরেজরা ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নিল। মাত্র কলকাতার জমিদার জন জেফানিয়া হলওয়েলের নেতৃত্বে কয়েকজন সাহসী লোক দুর্গের মধ্যে রয়ে গেল। পরদিন তারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেন না। দুর্গ নবাববাহিনীর করায়ত্ত হল।

এরপর নবাব কলকাতার নাম পরিবর্তন করে 'আলিনগর' রাখলেন, এবং শাসনভার মানিকচাঁদ নামে একজন হিন্দু শাসকের ওপর দিলেন।

চার

কলকাতা থেকে ফিরে এসে সিরাজ পূর্ণিয়ার শাসক শৌকত জঙ্গকে সায়েস্তা

করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিরাজ রাসবিহারী নামে এক ব্যক্তিকে পূর্ণিয়ার বীরনগরের ফৌজদার নিযুক্ত করে পাঠালেন, এবং শৌকত জঙ্গকে আদেশ দিলেন যে রাসবিহারীকে যেন তার পদে অধিষ্ঠিত হতে দেওয়া হয়। শৌকত সম্রাটের আদেশনামা (আগে দেখুন) প্রদর্শন করে বলল যে সম্রাট তাকেই বিহার, বাঙলা ও ওড়িশার শাসক নিযুক্ত করেছেন। সেই আদেশ অনুযায়ী সিরাজ যেন গদিত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করে। সিরাজ এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সেনাপতি মোহনলালের নেতৃত্বে এক বাহিনী নিয়ে রাজা কমলনারায়ণের সমভিব্যাহারে শৌকতকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে শৌকত নিহত হয়।

পাঁচ

এদিকে কলকাতার পতনের পর ইংরেজদের এক দ্রুতগামী জাহাজ এই বিপর্যয়ের খবর মাদ্রাজে নিয়ে যায়। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ অকটোবর তারিখে মাদ্রাজ থেকে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে কলকাতার দিকে রওনা হয় পাঁচখানা যুদ্ধের জাহাজ (কেণ্ট, কামবারল্যাণ্ড, টাইগার, স্যালিসবারী ও ব্রিজওয়াটার), একখানা কামানবাহী জাহাজ (ব্লেজ), তিনখানা বাণিজ্যতরী (প্রোটেকটর, ওয়ালপোল ও মারলবরো), ও তিনখানা দুই মাস্তুলওয়ালা ছোট জাহাজ (ল্যাপউইং, স্নো ও বনেটা)। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর জাহাজগুলো ফলতায় এসে উপস্থিত হয়।

ফলতা থেকে ইংরেজবাহিনী স্থলপথে ক্লাইভের ও জলপথে ওয়াটসনের নেতৃত্বে কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়। বজবজে ক্লাইভ মুসলমানদের একটা দূর্গ অধিকার করে নেয়। ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে অগ্রসর হতে দেখে নবাবের লোকেরা কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে আবার ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীয়মান হয়। ১০ জানুয়ারী তারিখে ক্লাইভ হুগলী নগরী দখল করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। তারপর ইংরেজরা কলকাতায় ফিরে এসে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করে।

কলকাতায় ফিরে এসে ক্লাইভ এক সঙ্গীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কেননা, নবাব এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আবার কলকাতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে সে সময় ইওরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুন ইংরেজরা সব সময়ই ভয় পেতে লাগল পাছে চন্দ্রনগর থেকে ফরাসীরা কলকাতার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নবাবের বাহিনীতে ছিল ১৫,০০০ পদাতিক, ১০,৯০০ বিলদার, ৪০টি কামান, ৫০টি হাতি ও তার পিছনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক বিরাট জনতা। ইংরেজদের তখন সম্বল হচ্ছে মাত্র ৭০০ ইওরোপীয় পদাতিক, ১৫০০ এদেশীয় সিপাই, ১৪টি কামান সহ ৮০০ গোলন্দাজ ও জাহাজের নাবিকেরা। কিন্তু সম্বল স্বল্প হলেও ক্লাইভ তার রণকৌশলে নবাবের বাহিনীকে শিয়ালদহের কাছে পরাহত করে। নবাব পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন দমদমের শিবিরে। নবাব সেখান থেকে শান্তি-স্থাপনের প্রত্যাশায় লিখে পাঠান যে তিনি কলকাতা ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হবেন। ইংরেজরা নবাবকে সদুত্তর দেওয়ায়, নবাব মুরশিদাবাদে ফিরে যান।

ছয়

এদিকে ইওরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল, সেই সম্পর্কে ক্লাইভ চন্দ্রনগরের গভর্নরকে লিখে পাঠান যে বাঙলাদেশে তাদের পক্ষে নিরপেক্ষতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পণ্ডিচেরীর গভর্নরের বিনা অনুমতিতে চন্দ্রনগরের গভর্নর ক্লাইভের প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তখন ক্লাইভ ও ওয়াটসন সিরাজ কর্তৃক অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রদত্ত এক অনুমতিপত্রের বলে, চন্দ্রনগর আক্রমণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে চন্দ্রনগর অধিকৃত হয়। কিন্তু ইংরেজরা শীঘ্রই দেখে যে সিরাজ ফরাসীদের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, ইংরেজদের বাঙলাদেশ থেকে তাড়াবার জন্য। ইংরেজরা এতে ক্ষুব্ধ হয়। সিরাজের অমাত্যরা সিরাজের এই নীতিকে মূর্খতা বলে মনে করে। এই সময় নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে এক চক্রান্ত শুরু করে দেয়। এই চক্রান্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল নবাবকে গদিচ্যুত করে মীরজাফরকে নবাব করা। ক্লাইভ এতে সম্মত হয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে ক্লাইভ সসৈন্য মুরশিদাবাদের দিকে যাত্রা করে। ২৩ জুন তারিখে পলাশী নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামের কাছে নবাববাহিনী ক্লাইভবাহিনীর মুখোমুখী হয়। নবাব 'পরাজিত' হয়ে মুরশিদাবাদে পালিয়ে যান। রাত্রিকালে নবাব বেগম লুৎফ-অল-উন্নিসাকে নিয়ে গোপনে মুরশিদাবাদ ত্যাগ করেন। নিরাপত্তার আশায় উত্তরপ্রদেশের দিকে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে দানা শাহ নামে এক মুসলমান ফকির (যাকে সিরাজ একবার

অপমান করেছিলেন) তাঁকে আশ্রয় দিয়ে গোপনে সে খবর মীরজাফরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। মীরজাফরের লোকেরা এসে সিরাজকে ধরে নিয়ে যায়। মহম্মদী বেগ নামে এক ঘাতককে দিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়। যুদ্ধ হিসাবে নগণ্য হলেও, এরই ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়ায় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন। (পরিশিষ্ট দেখুন)।

ইংরেজের প্রভুত্ব

পলাশী যুদ্ধের পরই মীরজাফর ক্লাইভের সঙ্গে দাউদপুরে দেখা করে। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯ জুন তারিখে ক্লাইভ মীরজাফরকে নবাবের মসনদে বসান। এই সময় থেকেই ইংরেজরা বাঙলার প্রকৃত অধিপতি হয়ে দাঁড়ায়, যদিও শাসনভার নবাবের হাতেই থাকে।

ইংরেজরা নবাবের কাছ থেকে অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা সংগ্রহ করে। তারা ২৪ পরগণার জমিদারী স্বত্ব পায়, বিনাশুল্কে ব্যবসা করবার অধিকার লাভ করে, এবং বাঙলার অভ্যন্তরস্থ অঞ্চলে কুঠি নির্মাণের অধিকার পায়। কলকাতায় তারা একটা টাঁকশালও স্থাপন করে, যেখানে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৯ আগস্ট তারিখ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিজ নামে মুদ্রা নির্মাণ হতে থাকে।

নবাব ইংরেজদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় নবাব বুদ্ধিহীনের মত দুর্লভরাম, রামনারায়ণ সিং প্রভৃতির ন্যায় বিচক্ষণ হিন্দু কর্মচারীদের বরখাস্ত করে। এর ফলে রাজ্যের সর্বত্র অসন্তোষ ও বিদ্বেষ প্রকাশ পায়। পাটনা, পূর্ণিয়া, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। নবাব ক্লাইভকে তা দমন করতে বলে। নবাবের এই উপকার সাধনের জন্য ইংরেজরা বিহারের সোরা বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পায়।

১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম বাঙলা আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে বিহারের সীমান্তে এসে আবির্ভূত হন। নবাব তখন ইংরেজদের কাছ থেকে আবার সাহায্য প্রার্থনা করে। এর বিনিময়ে ইংরেজরা কলকাতার পার্শ্ববর্তী সমস্ত অঞ্চলের খাজনা আদায়ের অধিকার পায়।

ইংরেজদের এ রকম উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি দেখে ওলন্দাজরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ভীতিগ্রস্ত হয়ে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালায়। এ সময় নবাবও ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে ওলন্দাজদের উৎসাহিত করে। নবাবের প্রকৃত মনোভাব যাই থাকুক না কেন, চুঁচুড়া ও চন্দ্রনগরের অন্তবর্তী বেদারা নামক স্থানের যুদ্ধে নবাব ইংরেজদেরই পক্ষ অবলম্বন করে। বেদারার যুদ্ধে ওলন্দাজরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়, এবং ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু

এই পরাজয়ের পরমুহূর্তেই মীরজাফরের পুত্র মীরণ ওলন্দাজদের শাস্তি দেবার জন্য চুঁচুড়ায় এসে হাজির হয়। কিন্তু ইংরেজদের মধ্যস্থতায় ওলন্দাজরা মীরণের রোষের হাত থেকে রক্ষা পায়, তবে তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে তারা ভবিষ্যতে আর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হবে না, সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করবে না, এবং নিজ অঞ্চলে আর কোনরূপ দুর্গ নির্মাণ করবে না। বস্তুতঃ এর পর থেকেই বাঙলা দেশে ওলন্দাজদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ওলন্দাজদের ঘাঁটি বরানগর ইংরেজদের হাতে চলে আসে। চুঁচুড়া আসে ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে।

দুই

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ বিলাত চলে যান। বাঙলায় কোম্পানির পরিচালনার ভার হলওয়েলের ওপর ন্যস্ত হয়। এই সময় কোম্পানির বোর্ড অভ্ ডিরেকটরস্‌রা লিখে পাঠান যে কোম্পানির সাহায্যার্থে তাঁরা বিলাত থেকে কোন অর্থ পাঠাবেন না, কেননা কোম্পানি বাঙলায় যথেষ্ট অর্থ অর্জন করছে। অর্থের অভাবে হলওয়েল নবাবের ওপর চাপ দিয়ে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী কিস্তির টাকা চেয়ে পাঠান। কিন্তু নবাবের খাজাঞ্চীখানা তখন শূন্য। নিজ সৈন্যদেরই তখন তিনি মাহিনা দিতে পারছিলেন না এবং তারা বিদ্রোহ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। নবাবের তখন না আছে অর্থ, না আছে সামর্থ্য। নিজ প্রজাদের তখন তিনি কোম্পানির কর্মচারিগণ কর্তৃক 'দস্তক' আদায়ের জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারছিলেন না। তাছাড়া, কোম্পানির কর্মচারীদের জুলুমের ফলে দেশীয় বণিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। একজন ইংরেজ লেখক বলে গেছেন—'**Bengal by this time had fallen into a state of anarchy and misery**'। এই পরিস্থিতির জন্য হলওয়েল নবাবকেই দায়ী করলেন, এবং চক্রান্ত করে নবাবকে গদিচ্যুত করে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে তার জামাতা মীরকাশিমকে গদিতে বসালেন।

তিন

চরিত্র এবং দক্ষতায় মীরকাশিম তাঁর শ্বশুর মীরজাফরের একেবারে বিপরীত ছিলেন। বস্তুতঃ তিনি দৃঢ় চরিত্র ও অসাধারণ শাসনপটুতার অধিকারী

ছিলেন। ইংরেজদের অনুসৃত সুশৃঙ্খল কায়দায় নিজ সৈন্যবাহিনীকে পুনর্বিন্যাস করে তিনি নিজেকে শক্তিমান করেন। তারপর তিনি রাজকোষের উন্নতির দিকে মন দেন। অবাধ্য জমিদারদের তিনি দমন করেন, এবং প্রবীণ কর্মচারীরা খাজিরি-জমা নামে যে রাজস্ব লুকিয়ে রাখত, তা প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করেন। রাজকোষ বর্ধিত করে, তিনি কোম্পানির নিকট নবাবের যে বকেয়া ঋণ ছিল তা পরিশোধ করেন। সৈন্যবাহিনীর বকেয়া মাহিনাও তিনি প্রদান করেন। রাজ্যের সর্বত্র তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। কর্মপটুতায় তিনি মুরশিদকুলি খানের সমকক্ষ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে গোলাম হুসেন সলীম তাঁর ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে রচিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' গ্রন্থে লিখেছেন—"In unravelling the intricacies of affairs of government and especially the knotty mysteries of finance, in examining and determining private differences, in establishing regular payment for his troops and for his household ; in honouring and rewarding men of merit and men of learning, in conducting his expenditure exactly between the extremities of parsimony and prodigality ; and in knowing intuitively where he must spend and where with moderation—in all these qualifications he was an incomparable man indeed and the most extraordinary prince of his age" (Ghulam Husain Salim, *Riyaz-us-salatin* translated by Abdus Salam, quoted in A. K. Sur's "History and Culture of Bengal", 1963 page 173)। তাঁর গুণের জন্য দিল্লীর বাদশাহ তাঁকে 'আলীজাহ নসীর-উল-মুলক এমতাজদ্দৌলা কাশিম আলি খান নশরৎ জঙ্গ' উপাধি দিয়েছিলেন।

মীরকাশিমের মত সুদক্ষ ও সুযোগ্য নবাবের পক্ষে তাঁর প্রজাবৃন্দের ওপর কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার ও লোভাতুর আচরণ সহ্য করা অসম্ভব ছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা এ সময় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত। মাল কেনা-বেচা সম্পর্কে লোকদের ওপর অত্যাচার ও দুর্দান্ত জুলুম করত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেখানে নবাবের কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ করত, তা তারা পদদলিত করত। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইংরেজ কর্মচারীদের এরূপ আচরণ নিবারণ করতে না

পেরে, মীরকাশিম নিজ প্রজাবৃন্দকে ইংরেজদের সঙ্গে সমান পর্যায়ে ফেলবার জন্য ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যের সর্বত্র বাণিজ্য শুল্ক রহিত করেন। ইংরেজরা বাণিজ্য শুল্ক পুনরায় ন্যস্ত করবার দাবী জানায়। নবাব সে দাবী গ্রাহ্য করতে অস্বীকৃত হন। এই সকল বিবাদ-বিসংবাদের ফলে নবাবের সহিত ইংরেজদের শত্রুতা ঘটে। ইংরেজরা যখন নৌপথে পাটনায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল, নবাবের কর্মচারীরা তখন তা আটক করে। এর ফলে কোম্পানির পাটনা কুঠির অধিকর্তা এলিস নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং পাটনা দখল করে নেয়। মীরকাশিমের সৈন্যবাহিনী শীঘ্রই পাটনা পুনরুদ্ধার করে ও এলিস সমেত অন্যান্য ইংরেজদের বন্দী করে। কিন্তু গিরিয়া, সুতি ও উদয়নালার যুদ্ধে (১৭৬৩) নবাববাহিনী পরাজিত হয়। ক্রুদ্ধ হয়ে নবাব ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করে। (ওয়ালটার রাইনহার্ট ওরফে 'সম্বর' নামে নবাবের একজন জার্মান কর্মচারী নবাবের আদেশে এই কাজ করে)। উদয়নালার যুদ্ধের পূর্বে নবাব রাজা রামনারায়ণকেও হত্যা করেন এবং রাজা রাজবল্লভকে মুঙ্গেরে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারেন। পাটনার পথে নবাব জগৎশেঠ, মহাতপরায় ও তাঁর ভ্রাতা স্বরূপচাঁদ এবং রাজা উনিদরায়কেও খতম করেন।

ইংরেজরা যখন পাটনা পুনঃদখল করে, মীরকাশিম তখন পালিয়ে গিয়ে অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার কাছে আশ্রয় নেয়। অযোধ্যার নবাব, সম্রাট শাহ আলম ও কয়েকজন দুঃসাহসিক ফরাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করে। অযোধ্যা ও বিহারের উপপ্রান্তে কয়েকটি অমীমাংসিত সংঘর্যের পর, বকসারের যুদ্ধে (১৭৬৪) ইংরেজদের হাতে মীরকাশিমের যুক্ত-বাহিনী পরাজিত হয়। মীরকাশিম দিল্লীতে পালিয়ে যায়, এবং দিল্লীর নিকট পাশোয়ান গ্রামে দুরবস্থার মধ্যে উদরী রোগে তার মৃত্যু ঘটে।

চার

ইংরেজরা মীরজাফরকে আবার বাঙলার মসনদে বসায় (১৭৬৩)। এই সময় ইংরেজরা মীরজাফরের সঙ্গে এক নূতন সন্ধি করে। এই সন্ধি অনুযায়ী মীরজাফর বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদের দিয়ে দেয়। তাছাড়া ইংরেজরা লবণ ব্যতীত বাঙলাদেশে আর সব পণ্যের বাণিজ্য বিনাশুল্কে করবার অনুমতি পায়। মীরজাফর ইংরেজদের ত্রিশ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হয়

ও মুরশিদাবাদে ইংরেজদের একজন আবাসিক প্রতিনিধি রাখবার অনুমতি দেয়।

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কুষ্ঠরোগে মীরজাফরের মৃত্যুর পর, ইংরেজরা মীরজাফরের পুত্র নজম-উদ-দৌল্লাকে নবাবের মসনদে বসায়। নবাব হবার পর নজম-উদ-দৌল্লা ইংরেজদের সঙ্গে এক চুক্তি করে। ওই চুক্তির বলে নবাব ইংরেজদের হাতে নিজামত (রাষ্ট্রশাসন, সৈন্যবাহিনী, প্রতিরক্ষা, পুলিশ ইত্যাদি) তুলে দেয়, এবং নিজের সম্মান ও রাজস্ব আদায়ের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের প্রয়োজন, তা নিজ হাতে রাখেন। ইংরেজদের অনুমতি ব্যতীত নিজ কর্মচারী নিয়োগের অধিকারও তিনি হারান। ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকে, এবং নূতন নবাবের কাছ থেকে তারা ১৫ লক্ষ টাকা উপঢৌকন পায়। উপঢৌকনটা আর কিছুই নয়, ঘুষ মাত্র। এখানে এই উপঢৌকন সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলা দরকার। সিরাজউদ্দৌলার বদলে মীরজাফরকে নবাব করবার সময় ক্লাইভ ঘুষ পেয়েছিল ২১১,৫০০ পাউণ্ড, ওয়াটস ১১৭,০০০ পাউণ্ড, কিলপ্যাট্রিক ৬০,৭৫০ পাউণ্ড, ওয়ালশ ৫৬,২৫০ পাউণ্ড, ড্রেক ৩১,৫০০ পাউণ্ড, ম্যানিংহাম ও বেশার প্রত্যেকে ২৭,০০০ পাউণ্ড, স্ক্রাফটন ২২,৫০০ পাউণ্ড, বোডাম, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, ম্যাকেট, কোলেট, অমিয়ট ও মেজর গ্রান্ট প্রত্যেকে ১১,০০০ পাউণ্ড করে। লুশিংটন পেয়েছিল ৫,৬২৫ পাউণ্ড। আর মীরজাফরের বদলে মীরকাশিমকে নবাব করবার সময় ভ্যানসিটার্ট নিয়েছিল ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড, হলওয়েল ৩০,৯৩৭ পাউণ্ড, ম্যাকগুইয়ার ২৯,৩৭৫ পাউণ্ড, সামনার ২৮,০০০ পাউণ্ড, কেলড ২২,৯১৬ পাউণ্ড এবং স্মিথ ও ইয়র্ক প্রত্যেকে ১৫,৩৫৪ পাউণ্ড। আর নজম-উদ-দৌল্লাকে নবাবের গদিতে বসাবার সময় ক্লাইভ দক্ষিণা পেয়েছিল ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড, কার্নাক ৩২,৬৬৬ পাউণ্ড, জনস্টোন ২৭,৬৫০ পাউণ্ড, স্পেনসার ২৩,৩৩৩ পাউণ্ড, সিনিয়র ২০,১১৫ পাউণ্ড, মিডলটন ১৪,২৯১ পাউণ্ড, লেসেস্টার ১৩,১২৫ পাউণ্ড, প্লেডেল, বার্ডেট ও গ্রে প্রত্যেকে ১১,৬৬৭ পাউণ্ড করে, ও জি. জনস্টোন ৫,৮৩৩ পাউণ্ড। এছাড়া মেজর মুনরো ও তার সহকারীরা সকলে মিলে ১৬,০০০ পাউণ্ড পেয়েছিল। এ তো গেল নবাব অদল-বদলের সময়ের প্রাপ্তিযোগ। এ ছাড়া, জমিদারী বিলি-ব্যবস্থার সময়ও তারা যথেষ্ট ঘুষ নিত। এক কথায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজদের ঘুষ নেবার কোন সীমা ছিল না। অবশ্য, মাত্র সাহেবরাই যে ঘুষ নিত তা নয়। তাদের এদেশী সহকারী দেওয়ানরাও ঘুষ

নিত। তাদের এদেশী সহকারীরা এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করে কলকাতায় সম্ভ্রান্ত পরিবারসমূহের পত্তন করে গেছে।

পাঁচ

বস্তুতঃ বকসারের যুদ্ধের পর বাঙলার নবাব মাত্র সাক্ষীগোপালে পরিণত হয়। প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে চলে যায়। তাদের অত্যাচার, স্বার্থান্ধতা ও জুলুম দেশের মধ্যে এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অবহিত হয়ে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত কোর্ট অভ ডিরেকটরসরা ক্লাইভকে পুনরায় বাঙলার গভর্নর করে পাঠান (১৭৬৫)। এখানে পৌঁছে ক্লাইভ যে পরিস্থিতি দেখেন, তা তাঁর নিজের ভাষায়—"A presidency divided, headstrong and licentious, a government without subordination, discipline or public spirit……amidst a general stagnation of useful industry and of licensed commerce, individuals were accumulating immense riches, which they had ravished from the insulted prince and his helpless people who groaned under the united pressure of discontent, poverty and oppression…… Such a scene of anarchy, confusion, bribery, corruption and extortion was never seen or heard of in any country but Bengal; nor such and so many fortunes acquired in so unjust and rapacious a manner. The three provinces of Bengal, Bihar and Orissa, producing a clear revenue of £3,000,000 sterling had been under the absolute management of the company's servants, ever since Mirjafar's restoration to the subaship; and they exacted and levied contributions from every man of power and consequence, from the Nawab down to the lowest zemindar." (Quoted in A. K. Sur's "History & Culture of Bengal", 1963, page 175)।

এই শোচনীয় পরিস্থিতির সংশোধনে ক্লাইভ আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের দিয়ে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়ে নেন যে তারা

ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতে পারবে না ও কোনরূপ উপঢৌকন গ্রহণ করবে না। এই সংস্কারের জন্য ক্লাইভ এদেশবাসী ইংরেজদের কাছ থেকে ঘৃণাব্যঞ্জক নিন্দা অর্জন করেন। কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি এদেশের লোকরা যে সকল সামগ্রী ব্যবহার করত, যেমন—লবণ, আফিম, পান ইত্যাদির আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার তাদের দেন। যখন বিলাতের কোর্ট অভ্ ডিরেকটরসরা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের এরূপ একচেটিয়া অধিকার বিতরণ সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে, তখন তিনি তার প্রতিবাদও জানান।

ক্লাইভ সৈন্যবিভাগেরও সংস্কার করেন। সৈন্যবিভাগে তিনি যুগল-বাট্টা প্রণালী রহিত করেন। সৈন্যবাহিনীর গঠনেরও তিনি পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি সৈন্যবিভাগকে তিনটি ব্রিগেডে বিভক্ত করেন। প্রত্যেক ব্রিগেডে থাকে একদল ইংরেজ পদাতিক, একদল গোলন্দাজ, ছয়দল এদেশী সিপাহী ও একদল এদেশী অশ্বারোহী সৈন্য। মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য এই তিনটি ব্রিগেডকে তিনি যথাক্রমে মুঙ্গের, বাঁকিপুর ও আলাহাবাদে অবস্থিত করান। অযোধ্যার নবাব ও সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে তিনি এক বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি প্রদানের পরিবর্তে তিনি সম্রাটের কাছ থেকে বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী (রাজস্ব শাসন) সংগ্রহ করেন। দেওয়ানী লাভের ফলে এখন থেকে ইংরেজরাই এই তিন প্রদেশের রাজস্ব আদায় করবে, সম্রাট মাত্র একটা বার্ষিক বৃত্তি পাবেন। এর ফলে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে নিজামত (যা ইংরেজরা নবাব নজম-উদ-দৌল্লার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিল) ও দেওয়ানী, এ দুই-ই ইংরেজদের হাতে এসে পড়ে, এবং তারাই এদেশের প্রকৃত শাসক হয়ে দাঁড়ায়।

দেওয়ানী লাভের পর আরও সাত বছর পর্যন্ত আগেকার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনই বলবৎ থাকে (পরে দেখুন) এবং কোম্পানির নায়েব-দেওয়ানরূপে মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙলার ভূমিরাজস্বের পরিচালনা করতে থাকেন। এর ফলে দ্বৈতশাসনের প্রবর্তন হয় (নীচে দেখুন)। কিন্তু অত্যধিক রাজস্ব দাবী, বাৎসরিক ইজারা দান ইত্যাদির ফলে দেশের মধ্যে এক স্বৈরতান্ত্রিক অরাজকতার আবির্ভাব ঘটে।

ছয়

দেওয়ানী পাবার পর ইংরেজরাই যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধীশ্বর হলেন, এটা অন্যান্য ইওরোপীয় জাতিগণের কাছে গোপন রাখবার জন্য, ক্লাইভ আনুষ্ঠানিকভাবে দেশশাসনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। নবাবই দেশ-শাসন করছেন, এটা বাহ্যত দেখাবার জন্যই তিনি নবাবের নিযুক্ত দুই পূর্বতন প্রতিভূকে—মুরশিদাবাদে মহম্মদ রেজা খান ও পাটনায় রাজা সিতাব রায়কে—তাদের রাজস্ব আদায়ের কাজে বহাল রাখেন। তারাই রাজস্ব আদায় করবে, মাত্র রাজস্ব আদায়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট টাকা পাবে, এরূপ স্থিরীকৃত হয়। এর ফলে দেশের মধ্যে দ্বৈতশাসনের প্রবর্তন হয়। কিন্তু দ্বৈতশাসন হয়ে দাঁড়ায় প্রজাপীড়ন ও নির্মম অত্যাচারের এক যন্ত্র। এ সম্পর্কে দেবীসিংহ-এর অমানুষিক অত্যাচার বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। দেবীসিংহ ছিলেন পাঞ্জাবের লোক। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি বাঙলা দেশে আসেন। মহম্মদ রেজা খাঁ তাঁকে পূর্ণিয়ার ইজারাদার করেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য দেবীসিংহ কোন রকম অত্যাচার, অবিচার ও অন্যায় করতে দ্বিধা করত না, তাঁর অত্যাচার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অন্যতম কারণ। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে সে বেনামীতে রঙপুর, দিনাজপুর ও এদরাকপুর ইজারা নেয়। ইটাকুমারীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের ওপর সে অমানুষিক অত্যাচার করে। তাঁর শোষণের ফলে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে রঙপুরের জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের নেতা ছিল নুরুলুদ্দিন। তিনি নিজেকে 'নবাব' ঘোষণা করেন ও দয়াশীল নামে এক প্রবীণ কৃষককে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করে দেবী-সিংহকে কর না দেবার আদেশ জারি করেন। তাঁর অনুচররা দেবীসিংহ ও ইংরেজদের ঘাঁটি মোগলহাট বন্দরের ওপর আক্রমণ চালায়। এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধে নুরুলুদ্দিন জখম ও বন্দী হন ও কয়েক দিন পরে মারা যান।

দেবীসিংহের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচার হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে সে মুক্তি পায়। এই দেবীসিংহই নসীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ বিলাতে ফিরে যান। সেই সময় থেকে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের নিয়োগ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজদের বিষয়-ব্যাপার ভেরেলস্ট ও কার্টিয়ারের হাতে ছিল। তাদের শাসনকালে দেশের মধ্যে দুর্নীতির আবার পুনঃ প্রকোপ হয়, যার ফলে দেশ ধ্বংসের পথে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে। রিচার্ড বেচার নামে কোম্পানির একজন কর্মচারী ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে এই

পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোর্ট অভ্ ডিরেকটরসদের এক গোপন কমিটির কাছে লিখে পাঠান—"It must give pain to an Englishman to have reason to think that since the accession of the Company to the Diwani, the condition of the people of the country has been worse than it was before; and yet I am afraid the fact is undoubted···the fine country which flourished under the most despotic and arbitrary government, is verging towards ruin···when the English received the grant of the Diwani, their consideration seems to have been the raising of as large sums from the country as could be collected to answer the pressing demands from home and to defray large expenses here." (Richard Becher's letter to the Select Committee of the Directors in 1769 quoted in A. K. Sur's "History & Culture of Bengal" 1963 ; page 177)।

বেচারের চিঠির ভিত্তিতে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে এদেশী কর্মচারীদের ওপর নজর রাখবার জন্য সুপারভাইজার অভ্ রেভেন্যু নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু এরই পদাঙ্কে বাঙলায় আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

সাত

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মত মর্মান্তিক ঘটনা, আর দ্বিতীয় ঘটেনি। মন্বন্তর বাঙলা দেশকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করেছিল যে পরবর্তী কালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙলার লোকের কাছে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নরূপ কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছিল। সমসাময়িক দলিলসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত নিজ অনুশীলনের ভিত্তিতে লিখিত ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার তাঁর 'অ্যানালস্ অভ্ রুরাল বেঙ্গল' বইতে এর এক বিশ্বস্ত বিবরণ দিয়েছেন। হাণ্টারের বর্ণনা— '১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের প্রবল উত্তাপে মানুষ মরিতে লাগিল। কৃষক গরু বেচিল, লাঙ্গল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, তারপর ছেলেমেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ক্রেতা নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল। ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল। তারপর মৃতের মাংস খাইতে লাগিল। সারাদিন সারারাত্র অভুক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ বড় বড়

শহরের দিকে ছুটিল। তারপর মহামারী দেখা দিল। লোকে বসন্তে মরিতে লাগিল। মুরশিদাবাদের নবাবপ্রাসাদও বাদ গেল না। বসন্তে নবাবজাদা সইফুজের মৃত্যু ঘটিল। রাস্তায় মৃত ও নির্ধনীর শবে পূর্ণ হয়ে পাহাড়ে পরিণত হইল। শৃগাল কুকুরের মেলা বসিয়া গেল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদের পক্ষে বাঁচিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।' অনুরূপ বর্ণনা বঙ্কিমও তাঁর 'আনন্দমঠ'-এ দিয়েছেন। বঙ্কিম লিখেছেন—'১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রৌদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। ···সম্মুখে মন্বন্তর ···লোক রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙ্গল বেচিল, জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রীকে কেনে খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছা খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল, যাহারা পলাইল না, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল, গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল।'

লর্ড মেকলেও তাঁর বর্ণাঢ্য ভাষায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এক করুণ চিত্র দিয়েছেন—

"In the summer of 1770 the rains failed ; the earth was parched up ; and a famine, such as is known only in the countries where every household depends for support on its own little patch of cultivation filled the whole valley of the Ganges with misery and death. Tender and delicate women, whose veils had never been lifted before the public gaze, came forth from their inner chambers in which Eastern zealousy had kept watch over their beauty, threw themselves on the earth before the passerby, and, with loud wailings, implored a handful of rice for their children. The Hooghly everyday rolled down thousands of corpses close to the porticos and gardens of the

English conquerors. The very streets of Calcutta were blocked up by the dying and dead. The lean and feeble survivors had not energy enough to bear the bodies of their kindred to the funeral pile or to the holy river or even to scare away jackals and vultures who fed on human remains in the face of the day ...It was rumoured that the Company's servants had created the famine by engrossing all the rice of the country". (Macaulay in essay on "Clive" quoted in A. K. Sur's "History & Culture of Bengal" 1963, pages 177-178)।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটেছিল অনাবৃষ্টির জন্য। তার আগের বছরেও বৃষ্টির স্বল্পতার জন্য ফসল কম হয়েছিল। তার জন্য চাউল মহার্ঘ্য হয়েছিল। কিন্তু লোক না খেয়ে মরেনি। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় লোক না খেয়ে মরেছিল। তার কারণ, যা চাউল বাজারে ছিল, তা কোম্পানি আকালের আশঙ্কায় সিপাইদের জন্য বাজার থেকে কিনে নিয়েছিল। কোম্পানি যখন চাউল কিনতে শুরু করল, তখন তারই পদাঙ্কে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যারা গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত, তারাও লাভের প্রত্যাশায় চাউল কিনে মজুত করল। সমসাময়িক এক বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে কোম্পানির যে কর্মচারীর এক বৎসর পূর্বে ১০০ পাউণ্ডেরও সংস্থান ছিল না, পর বৎসর সে ৬০,০০০ পাউণ্ড দেশে পাঠাল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রকোপে বাঙলা দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। আর কৃষকদের মধ্যে মারা গিয়েছিল শতকরা ৫০ জন। জনবহুল গ্রামসমূহ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল। বীরভূমের বহুগ্রাম এমন জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল যে এই ঘটনার দশ বছর পরেও সৈন্যদের পক্ষে সে সকল স্থান অতিক্রম করা সম্পূর্ণভাবে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। এত কৃষক মরে গিয়েছিল যে মন্বন্তরের পর নিজ নিজ জমিতে চাষী বসাবার জন্য জমিদারদের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটেছিল। তখন থেকেই বাঙলা দেশে খোদকস্ত রায়ত অপেক্ষা পাইকস্ত রায়তের সংখ্যা বেড়ে যায়।

মন্বন্তরে সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হয়েছিল জমিদাররা। কেননা এই সময় বাঙলার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ শতকরা দশটাকা হারে রাজস্ব বাড়িয়ে

দিয়েছিল। তার ফলে বাঙলায় কান্নার কোলাহল পড়ে গিয়েছিল। একে তো মন্বন্তরের বছর। লোক না খেতে পেয়েই মরে যাচ্ছে। জমিদারকে তারা খাজনা দিবে কি করে? জমিদারও প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা না পেলে সরকারে রাজস্ব জমা দেবে কেমন করে? জমিদারদের ওপরই গিয়ে পড়ল চূড়ান্ত নির্যাতন। তাদের উলঙ্গ করে বিছুটির চাবুক মেরে সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত করে দেওয়া হল। তারপর অচৈতন্য অবস্থায় তাদের অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। শুধু তাই নয়। স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ও পিতার সামনে কন্যাকে বিবস্ত্রা করে শুরু হল নিষ্ঠুর নির্যাতন। বর্ধমানের মহারাজা, নদীয়ার মহারাজা, নাটোরের রানী ভবানী, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের যে কি দুর্গতি হয়েছিল, সে সব হাণ্টার্ তাঁর 'অ্যানালস অভ্ রুরাল বেঙ্গল' বইয়ে লিখে গেছেন। এর প্রতিক্রিয়ায় জনগণ যে ক্ষিপ্ত হয়ে একটা সমাজ বিপ্লব ঘটাবে তা বলাই বাহুল্য মাত্র। হাণ্টার বলেছেন— 'অরাজকতা প্রসব করে অরাজকতা এবং বাঙলার দুর্দশাগ্রস্ত কৃষক সম্প্রদায় আগামী শীতকালের খাদ্যফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে ও দস্যুদ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে, নিজেরাই দস্যুতে পরিণত হল। যাঁরা প্রতিবেশীর নিকট আদর্শ চরিত্রের লোক বলে পরিগণিত হত, সে সকল কৃষকও পেটের দায়ে ডাকাতে পরিণত হল এবং সন্ন্যাসীর দল গঠন করল। তাদের দমন করবার জন্য যখন ইংরেজ কালেকটররা সামরিকবাহিনী পাঠাল, তখন এক এক দলে পঞ্চাশ হাজার সন্ন্যাসী, সিপাইদের নস্যাৎ করে দিল। মন্বন্তর এবং তার পরবর্তী কয়েক বছর এরূপই চলল। পরে অবশ্য ইংরেজদের হাতে তারা পরাভূত হল।' এটা সবই হাণ্টারের কাহিনী। এই কাহিনীকেই পল্লবিত করে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসকে 'আনন্দমঠ'-এর রূপ দিয়েছিলেন।

মন্বন্তর মাত্র এক বছরেরই ঘটনা। কিন্তু তার জের চলেছিল বেশ কয়েক বছর। মন্বন্তরের পরের দু'বছরে বাঙলা আবার শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছিল। লোক পেট ভরে খেতে পেল বটে, কিন্তু লোকের আর্থিক দুর্গতি চরমে গিয়ে পৌঁছাল। অত্যধিক শস্য ফলনের ফলে কৃষি পণ্যের দাম এমন নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছাল যে হাণ্টার বলেছেন—'হাটে শস্য নিয়ে গিয়ে বেচে গাড়ীভাড়া তোলাও দায় হল।' সুতরাং বাঙলার কৃষক নিঃস্বই থেকে গেল। এদিকে খাজনা আদায় পুরাদমে চলতে লাগল, এবং তার জন্য নির্যাতনও বাড়তে লাগল। কিন্তু নির্যাতনের পরেও অর্ধো রাজস্ব আদায় হল না। এটা পরবর্তী কয়েক বছরের খাজনা আদায়ের

পরিমাণ থেকে বুঝতে পারা যাবে—

বৎসর	দেয় রাজস্ব (পাউণ্ডে লিখিত)	আদায়ীকৃত রাজস্ব
১৭৭২	৯৯,৪১০	৫৫,[illegible]৬৭
১৭৭৩	১০৩,০৮৯	৬২,৩৬৫
১৭৭৪	১০১,৭৯৯	৫২,৫৩৩
১৭৭৫	১০০,৯৮০	৫৩,৯৯৭
১৭৭৬	১১১.৪৮২	৬৩.৩৫০

যেখানে উৎপন্ন শস্য হাটে নিয়ে গিয়ে বেচতে গেলে, গাড়ীভাড়াই ওঠে না, সে ক্ষেত্রে নিঃস্ব কৃষক খাজনা দেবে কি করে ? উপরে যে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ দেখানো হয়েছে, তা হচ্ছে নির্যাতন-লব্ধ খাজনা। সুতরাং নির্যাতন-লব্ধ খাজনা সন্ন্যাসীরা লুঠ করতে লাগল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এই ছিল এদের ধর্ম। সন্ন্যাসীদের এরূপ সংগঠন ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অনেক আগে থেকেই ছিল। এরূপ এক মঠাধ্যক্ষই রক্ষা করেছিল রানী ভবানীর বালবিধবা সুন্দরী কন্যা তারাসুন্দরীকে সিরাজের কুৎসিত কামলালসা থেকে।

সন্ন্যাসীদের একজন মঠাধ্যক্ষ কৃপানাথ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে রংপুরের বিশাল 'বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গল' অধিকার করেন। তাঁর ২২ জন সহকারী সেনাপতি ছিল। রংপুরের কালেকটর ম্যাকডোয়াল পরিচালিত বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্বারা জঙ্গল ঘেরাও হলে ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের খণ্ডযুদ্ধ হয়। বিদ্রোহিগণ বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যায়।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হলেও এতে ফকির সম্প্রদায়ও যোগ দিয়েছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য আরও যাঁরা প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ইমামবাড়ী শাহ, জয়রাম, জহুরী শাহ, দর্পদেব, বুদ্ধু শাহ, মজনু শাহ, মুসা শাহ, রামানন্দ গোঁসাই, ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী ও সোভান আলি। ('সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আট

কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের এই দুর্যোগের সময় ইংরেজরা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নবিলাসে মত্ত হয়ে, দক্ষিণ ভারতের যুদ্ধসমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

বস্তুত ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার আর্থিক সঙ্গতি নিম্নদিকে এমনই স্তরে গিয়ে পৌছায় যে এক সমসাময়িক প্রতিবেদনে বলা হল—"the company seemed on the verge of ruin"। কিন্তু দেশের এই শোচনীয় অবস্থা হলেও, কোম্পানির কর্মচারীরা (তাদের 'নবাব' আখ্যা দেওয়া হত) স্বদেশে ফেরবার সময় প্রচুর অর্থ সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এটা বিলাতের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়ালো না, এবং তারা বিলাতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য পার্লামেন্টে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস ও সাম্রাজ্য স্থাপন

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে বিলাতের কোর্ট অভ্ ডিরেকটরসরা ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাঙলার গভর্নর নিযুক্ত করেন। হেস্টিংস বাঙলায় এসে বাণিজ্যিক ও শাসন প্রণালীর সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দেন। বাণিজ্যিক ব্যাপারে তিনি 'দস্তক' প্রথার অবসান ঘটান। বিভিন্ন জমিদারীর মধ্যে অবস্থিত অসংখ্য কাস্টমস্ চৌকি দ্বারা ব্যবসায়ীরা যাতে না নিগৃহীত হয়, সেজন্য তিনি ওই সকল চৌকি তুলে দিয়ে কলকাতা, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, হুগলি ও পাটনায় মাত্র পাঁচটি কাস্টমস্ হাউস বসান। লবণ, শুপারি ও তামাক, যার ওপরে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার ছিল, সেগুলি ছাড়া তিনি সকল পণ্যের ওপর শুল্ক আড়াই শতাংশ হারে হ্রাস করেন। এই সকল সংস্কারের ফলে পণ্যদ্রব্যসমূহ বিনা নিগ্রহে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করতে থাকে। দ্বৈতশাসন অবসানের জন্য তিনি বাঙলা ও বিহার থেকে মহম্মদ রেজা খান ও সিতাব রায়কে তাদের পদ থেকে অপসারিত করেন। নবাবের গৃহস্থালীর তদারকী করবার ভার তিনি মীরজাফরের স্ত্রী মুনি বেগমের ওপর অর্পণ করেন ও তাকে সাহায্য করবার জন্য মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নিযুক্ত করেন। নবাবের বৃত্তি তিনি ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ১৫লক্ষ টাকায় হ্রাস করেন, ও খালসা (ট্রেজারী) মুরশিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। আমিনগণ কর্তৃক রাজস্ব আদায় প্রথাও তিনি বন্ধ করে দেন, এবং তার ভার কালেকটরদের ওপর ন্যস্ত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করেন। কয়েকটি জেলা নিয়ে এক একটি ডিভিসন বা বিভাগ গঠন করেন, এবং হিসাবপত্র রাখবার জন্য প্রতি বিভাগে একজন করে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। তাকে সাহায্য করবার জন্য প্রতি জেলায় একজন করে নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমস্ত প্রদেশ ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা কলকাতা, বর্ধমান, ঢাকা, মুরশিদাবাদ, দিনাজপুর ও পাটনা। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি ও অত্যাচার রোধ করবার জন্য ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি (তখন তিনি গভর্নর-জেনারেল) বিভাগীয় কালেকটরের পদ লুপ্ত করে, তাদের স্থানে এদেশীয় কর্মচারী নিযুক্ত করেন – তাদের তত্ত্বাবধানের জন্য কলকাতায় চার

সদস্যবিশিষ্ট (অ্যাণ্ডারসন, শোর, চাটরস্ ও ক্রফটস্) এক কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর ভার দেন। দুর্নীতিপরায়ণ বিচার পদ্ধতির উন্নতির জন্য তিনি দেওয়ানী মামলার জন্য দারোগা আদালত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সংস্কার করেন। তা ছাড়া, কলকাতায় দু'টি আপীল আদালত স্থাপন করেন—দেওয়ানী বিচারের জন্য সদর দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারী বিচারের জন্য সদর নিজামত আদালত।

আপীলের শুনানী প্রেসিডেন্ট ও কাউনসিলের দুই সদস্য শুনতেন, এবং দেওয়ানী মামলায় তাদের সাহায্য করতেন খালসার (রাজকোষের) দেওয়ান ও প্রধান কানুনগো, এবং ফৌজদারী মামলায় নাজিমের সহকারী, প্রধান কাজি ও মুফতি ও তিনজন মৌলবী। এ ছাড়া, তিনি (১) আদালতের কার্যবিবরণী যাতে লিপিবদ্ধ হয়, (২) মোকদ্দমা রুজু করবার কাল-সীমা, (৩) বিবাদী সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ উস্থল, (৪) অধমর্ণের দেহের ওপর উত্তমর্ণের অধিকার নাকচ, এবং (৫) সমস্ত বিবাদ যাতে সালিশীদ্বারা নিষ্পত্তির চেষ্টা হয়, সে সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন। এই ভাবে বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করবার পর, হেস্টিংস দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখবার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এ সময় বাঙলা দেশে ডাকাতির খুবই প্রকোপ ছিল। তাও তিনি দমন করেন। এ ছাড়া, কুচবিহার থেকে তিনি ভুটিয়াদের তাড়িয়ে দেন।

দুই

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ করে। এই আইন দ্বারা ভারতে শাসনভারের দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেন। এই আইন দ্বারা ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির (ক) 'কোর্ট অভ্ প্রোপ্রাইটরস্'দের ভোটাধিকার মাত্র ৫০০ থেকে ১০০০ পাউণ্ড মূল্যের শেয়ারহোলডারদের মধ্যে সীমিত করা হয়, (খ) কোম্পানির ডিরেকটরস্দের কার্যকাল চার বৎসর নির্দিষ্ট করা হয় ও শর্ত করা হয় যে তাদের এক-চতুর্থাংশকে প্রতি বৎসর অবসর গ্রহণ করতে হবে, (গ) কোর্ট অভ্ ডিরেকটরস্দের পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা হয়, এবং (ঘ) ভারতের শাসন সম্পর্কিত কোম্পানির প্রতি সামরিক ও বেসামরিক ব্যাপার একজন সেক্রেটারী অভ্ স্টেটের গোচরীভূত করা বাধ্যতামূলক করা হয়। তা ছাড়া, এই আইন দ্বারা ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারতের গভর্নর জেনারেল

নিযুক্ত করা হয় (১৭৭৪)। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নরদের তাঁর অধীনস্থ করা হয়। শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট এক কাউনসিল গঠিত হয়। প্রতি বিষয় এই কাউনসিলের গরিষ্ঠসংখ্যক সদস্যদের মতামতের ওপর নির্ভর করে। গভর্নর-জেনারেলকে কাউনসিলের সভাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং কোন বিষয়ে কাউনসিলের সদস্যরা যদি সমান সমান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা হলে গভর্নর-জেনারেলের 'কাস্টিং' ভোট দেবার ক্ষমতা থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এক রাজকীয় সনদ দ্বারা কলকাতায় ইংরেজ বিচারপতিবিশিষ্ট সুপ্রিম কোর্ট নামে এক আদালত স্থাপন করা হয়। নির্দেশ দেওয়া হয় যে বিচারপতিরা গভর্নর-জেনারেল ও কাউনসিল থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবে। কোম্পানির কর্মচারীদের উপঢৌকন গ্রহণ করা রহিত করা হয়, এবং নির্দেশ দেওয়া হয় যে সামরিক ও বেসামরিক ব্যাপার সংক্রান্ত সকল বিষয় বিলাতে অবস্থিত একজন নব-প্রবর্তিত সেক্রেটারী অভ্ স্টেট্-এর গোচরে আনতে হবে। গভর্নর-জেনারেলের মাহিনা নির্দিষ্ট হয় ২৫,০০০ পাউণ্ড, কাউনসিলের সদস্যদের ১০,০০০ পাউণ্ড এবং প্রধান বিচারপতির ৮,০০০ পাউণ্ড।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট প্রবর্তিত হবার পর হেস্টিংসকে সব সময়েই তার কাউনসিলের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। রহিলা যুদ্ধ ও ফৈজাবাদের সন্ধি সম্বন্ধে হেস্টিংস-এর নীতি কাউনসিল নিন্দা করে। হেস্টিংস-এর প্রতি এই বিরোধিতা শীঘ্রই সঙ্গিন আকার ধারণ করে। তার বিরুদ্ধে নানারকম তছরুপের অভিযোগ আসে। বর্ধমানের রাণী বলেন যে হেস্টিংস তার কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছে। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমার অভিযোগ আনেন যে হেস্টিংস মুনি বেগমকে নাবালকদের অভিভাবক নিযুক্ত করার সময় মুনি বেগমের কাছ থেকে ৩,৫৪,১০৫ টাকা ঘুষ নিয়েছে। এর প্রতিরোধার্থে হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন যে নন্দকুমার কামালুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের মামলা দায়ের করতে প্ররোচিত করেছে। কিন্তু কামালুদ্দিন হেস্টিংস-এর লোক প্রমাণিত হওয়ায় নন্দকুমার অব্যাহতি পান। তারপর নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক জালিয়াতির মামলা আনা হয়, এবং ইংরেজ বিচারপতিরা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে। ইংলণ্ডের আইন অনুযায়ী তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন (১৭৭৫)।

এই সময় মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে। এটা প্রথম মারাঠা যুদ্ধ

নামে প্রসিদ্ধ। বাঙলা দেশ থেকে সুদূর বোম্বাই প্রদেশে সৈন্য পাঠিয়ে ও কুটনীতি অবলম্বন করে হেষ্টিংস তাদের দমন করেন। এ ছাড়া, মহীশূরের অধিপতি হায়দার আলির সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে, এবং জঙ্গীলাট স্যার আয়ার কুট ও হায়দার দুজনেই নিহত হয়। হায়দারের মৃত্যুর পর তার পুত্র টিপু এই যুদ্ধ চালায়। শেষ পর্যন্ত হেষ্টিংস ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে টিপুর সঙ্গে মাঙ্গালোরে এক সন্ধি করতে বাধ্য হন।

এদিকে ইংলণ্ডে হেষ্টিংস-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে। পার্লামেণ্ট ভারতের ব্যাপার সম্পর্কে আগেই ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট দ্বারা বিলাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনের স্বাধিকার সঙ্কুচিত করেছিল। তারপর ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের Pitt's India Act দ্বারা ভারতে কোম্পানির কার্যকলাপ আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য বিলাতে একটি বোর্ড অভ্ কণ্ট্রোল স্থাপন করা হয়। এই বোর্ডের মোট ছয় জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন চ্যান্সেলার অভ্ একস্‌চেকার ও আর একজন বিলাতের মন্ত্রীসভার এক প্রধান সচীব। এই সচীবের নাম দেওয়া হয়েছিল সেক্রেটারী অভ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ান অ্যাফায়ারস্। বোর্ডের ওপর ভারতের রাজস্ব, সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত ব্যাপারের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া হয়। এখন থেকে কোম্পানির বোর্ড অভ্ ডিরেকটরস্ কর্তৃক ভারতে প্রেরিত ও ভারত থেকে প্রাপ্ত সমস্ত কাগজপত্রের নকল বোর্ডের কাছে পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। ভারতে শাসনভার গভর্নর-জেনারেল ও তিন সদস্যবিশিষ্ট এক কাউনসিলের ওপর ন্যস্ত করা হয়। রাজার সম্মতিক্রমে কোম্পানির ডিরেকটরগণকে গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করতে হবে। এ ছাড়া, বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গভর্নর-জেনারেল ও তার কাউনসিল ভারতে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীকে বাঙলার অধীনস্থ করা হয়।

গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা এভাবে খর্ব করায় ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে হেষ্টিংস পদত্যাগ করে বিলাতে চলে যান। সেখানে তিনি অন্যান্য কারণ ছাড়া, বারাণসীর সামন্ত রাজা চৈৎ সিংকে রাজ্যচ্যুত করা ও অযোধ্যার বেগমদের (নবাব ওয়াজির আসাফ-উদ-দৌলার মাতা ও পিতামহী) নির্যাতনের জন্য অভিযুক্ত হন, এবং সাত বছর মামলা চলবার পর তিনি সসম্মানে মুক্তি পান। বার্ক, শেরিডান, ফক্স প্রভৃতি বিখ্যাত বাগ্মীরা এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে

জ্বালাময়ী বক্তৃতার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

তিন

হেস্টিংস-এর পরবর্তী উত্তরাধিকারী স্যার জন ম্যাকফারসন-এর আমলে দেশের মধ্যে আবার বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পায়। সেজন্য ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে বিলাত থেকে লর্ড কর্নওয়ালিসকে গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত করে পাঠানো হয়। হেস্টিংস্ অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা তাঁর ওপর অর্পিত হয়। কাউনসিলের অধিকাংশের মতামতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়। এরূপভাবে ক্ষমতাপন্ন হয়ে তিনি শাসনযন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতি বিমুক্ত করেন। ভারতের সিভিল সার্ভিসকে তিনি দু'ভাগে বিভক্ত করেন—(১) জুডিসিয়াল ও (২) একজিকিউটিভ। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যার দ্বারা জমিদারদের অধিকার চিরস্থায়ী করা হয়। এ সম্বন্ধে কর্নওয়ালিসের যুক্তি ছিল, দশশালা বন্দোবস্তে জমিদারগণ জমি ও প্রজার উন্নতির প্রতি দৃষ্টি দেয় না। কিন্তু তাদের অধিকার চিরস্থায়ী করলে, তারা জমি ও প্রজার উন্নতির প্রতি যথাযথ নজর দেবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এটা ঘটেনি। তাঁর আমলে বীরভূম, বাঁকুড়া ও বগুড়া জেলায় ডাকাতির প্রকোপ আবার প্রকাশ পায়। কিন্তু কর্নওয়ালিস তা অচিরে দমন করেন।

কর্নওয়ালিসের উত্তরাধিকারী স্যার জন শোর-এর (১৭৯৩-১৭৯৮) আমল বিশেষ ঘটনাবহুল নয়। তাঁর পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮-১৮০৫) সাম্রাজ্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্খা নিয়ে আসেন। নেপোলিয়ান ভারত আক্রমণ করতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি ভারত থেকে 'ফরাসী দূত'কে বিতাড়িত করতে দৃঢ় সঙ্কল্প হন। মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান ফরাসীদের সঙ্গে চক্রান্ত করছে, জানতে পেরে তিনি টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে টিপু নিহত হয়, এবং তিনি মহীশূর জয় করেন। তখন থেকেই দক্ষিণ ভারত ইংরেজের অধীনে আসে। 'সাম্রাজ্য কখনও বণিকের দপ্তরখানা থেকে শাসিত হতে পারে না, এর জন্য চাই রাজপ্রাসাদ', এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি কলকাতায় রাজভবন নির্মাণ করেন। এছাড়া, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাইটার্স্ বিলডিং-এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন, যা পরবর্তীকালে শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে নবজাগৃতির প্রসূতিগার হয়ে দাঁড়ায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

বাঙলার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের ইতিহাসে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক বিতর্কিত ব্যাপার। কোন্ পরিস্থিতিতে এর উদ্ভব ঘটেছিল, তা এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভের পরবর্তী সাত বছর পূর্বতন ভূমিরাজস্ব প্রশাসনই বলবৎ রাখে। কোম্পানির তরফ থেকে কোম্পানির নায়েব দেওয়ানরূপে মহম্মদ রেজা খাঁ ভূমিরাজস্ব পরিচালনা করতে থাকে। এর ফলে দ্বৈতশাসনের উদ্ভব হয়। দ্বৈতশাসনের ফলে দেশের মধ্যে স্বৈরতন্ত্র ও অরাজকতা প্রকাশ পায় ও কৃষি-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটে। এরই পদাঙ্কে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। মন্বন্তরে বাঙলার অর্ধেক কৃষক মারা যায় ও আবাদী জমির অর্ধেকাংশ অনাবাদী হয়ে পড়ে। কিন্তু রেজা খাঁ খাজনার দাবী ক্রমশই বাড়াতে থাকে। এর ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পায়। এদিকে রাজস্ব সম্পর্কে কোম্পানির প্রত্যাশাও পূরণ হয় না। রাজস্বের টাকা আত্মসাৎ করবার অভিযোগও রেজা খাঁর বিরুদ্ধে আসে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর হয়ে আসেন, তখন তাঁকে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির সারকিট কমিটির তত্ত্বাবধানে জমিদারী মহলগুলিকে নিলামে চড়িয়ে দিয়ে, ইজারাদারদের সঙ্গে পাঁচশালা বন্দোবস্ত করেন। যারা ইজারা নেয়, তাদের অধিকাংশই কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেনিয়ান। এদের মধ্যে ছিলেন হেস্টিংস-এর নিজস্ব বেনিয়ান কান্তবাবু, কিন্তু ইজারাদারদের অধিকাংশই নিজেদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারে না। কোম্পানির সমস্ত প্রত্যাশাই ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার পর ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি জমিদারদের সঙ্গে বাৎসরিক বন্দোবস্ত করে।

পাঁচশালা পরিকল্পনার সময় থেকেই অনেকে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা তুলেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্নেল আলেকজাণ্ডার ডাউ, স্কটল্যাণ্ডের প্রখ্যাত কৃষিবিত্তাবিদ হেনরী পাটুলো ও কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী যথা মিডলটন, ডেকার্স, ডুকারেল, রাউস

প্রভৃতি। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সবচেয়ে বড় প্রস্তাবক ছিলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। তিনি বললেন, ভারতের বিধিবিধান অনুযায়ী জমিদাররাই জমির মালিক। অর্থনৈতিক মহলের ফিজিওক্রাটদের ভাবধারায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সেই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি বললেন, যে কৃষিই সামাজিক ধনবৃদ্ধির একমাত্র সূত্র এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারদের ভূমির মালিকানা স্বত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করলে, তাদের উদ্যোগে কৃষির পুনরভ্যুদয় ঘটবে এবং তাতে কোম্পানির আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে। ফ্রান্সিসের লেখার প্রভাবেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিধিবদ্ধ পিট-এর 'ভারত আইন'-এ রাজা, জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ীই ১৭৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাঙলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের সঙ্গে দশশালা বন্দোবস্ত করে। (দশশালা বন্দোবস্তের সময় আলাহাবাদের রাজা ও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করবার জন্য দেওয়ানীর ভার পেয়ে নোয়াখালির জগমোহন বিশ্বাস আলাহাবাদে যান। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দিয়ে তীর্থযাত্রীদের ওপর থেকে পূর্বপ্রচলিত তীর্থকর চিরতরে রহিত করেন)। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে এক রেগুলেশন দ্বারা এটাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হয়। এর সবচের বড় সমর্থক ছিলেন বিহারের কালেকটর টমাস ল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারেরা ও স্বাধীন তালুকদারেরা জমির মালিক ঘোষিত হয়। এর দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর জমিদারদের (যথা কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজাদের মত মোঘল যুগের করদ নৃপতি, রাজশাহী, বর্ধমান ও দিনাজপুরের রাজাদের মত পুরাতন প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ, মোঘল সম্রাটগণের সময় থেকে বংশানুক্রমিক-ভাবে রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদভোগী পরিবারসমূহ ও কোম্পানি কর্তৃক দেওয়ানী লাভের পর ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা) একই শ্রেণীভুক্ত করে তাদের সকলকেই জমির মালিক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের এক মিনিট-এ কর্নওয়ালিস মত প্রকাশ করেন—'আমার সুদৃঢ় মত এই যে ভূমিতে জমিদারগণের মালিকানা স্বত্ব দেওয়া জনহিতার্থে আবশ্যক।' বাঙলার জমিদারদের জমার পরিমাণ ২৬৮ লক্ষ সিককা টাকা নির্দিষ্ট হয়। কোম্পানির আর্থিক প্রয়োজন বিচার করেই জমার পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। যাতে নিয়মিতভাবে ভূমিরাজস্ব দেওয়া হয়, সেই উদ্দেশ্যে 'সূর্যাস্ত আইন' জারি করা হয়। এই

আইন অনুযায়ী কিস্তি দেওয়ার শেষ দিন সন্ধ্যার পূর্বে কোন মহালের টাকা জমা না পড়লে, সেই মহালকে নিলামে চড়ানো হত ; অনাদায়, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কোন অছিলাই চলত না। কর্নওয়ালিসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুনিশ্চিত আদায় ও কৃষির বিস্তার। কিন্তু কর্নওয়ালিসের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা কিছুই সিদ্ধ হয়নি। উপরন্তু জমিদাররা সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে দাঁড়ায় ও প্রজাপীড়ন ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।

দুই

এই একশালা, পাঁচশালা ও দশশালা বন্দোবস্তের অন্তরালেই ঘটেছিল বাঙলার বৃহত্তম জমিদারীর বিলুপ্তি। এ জমিদারী ছিল রাণী ভবানীর। বাঙলা দেশের প্রায় আধখানা জুড়ে ছিল এ জমিদারীর বিস্তৃতি। কোম্পানির রেভেন্যু কালেকটর জেমস্ গ্রাণ্ট বলেছেন—"Rajesahy, the most unwieldy and extensive zemindary of Bengal or perhaps in India". তাঁর এই বিশাল জমিদারী থেকে লব্ধ দেড় কোটি টাকা খাজনার অধেক তিনি দিতেন নবাব সরকারে, আর বাকী অর্ধেক ব্যয় করতেন নানারকম জনহিতকর ও ধর্মীয় কাজে। অকাতরে অর্থ দান করে যেতেন দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত প্রতিপালনে ও গুণীজনকে বৃত্তিদানে। তাঁর দান খয়রাতি ও বৃত্তিদান বাঙলা দেশে প্রবচনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দুর্দিনের জন্য কখনও তিনি কিছু মজুত করেন নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পদক্ষেপে যখন প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা অনাদায় রইল, তখন তাঁর জমিদারীর একটার পর একটা মহাল ও পরগণা নীলামে উঠল। সুযোগসন্ধানীরা সেগুলো হস্তগত করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কুকার্যসমূহের যারা সহায়ক ছিল, তারাই এল এগিয়ে। রাণী ভবানীর জমিদারীর অংশসমূহ কিনে নিয়ে তারা এক একটা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে বসল। কান্ত বাবু (যিনি হেস্টিংসকে সাহায্য করেছিলেন চৈত সিং-এর সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে এবং যেজন্য তার অংশবিশেষ তিনি পেয়েছিলেন) প্রতিষ্ঠা করলেন কাশিমবাজার রাজবংশ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন পাইকপাড়ার রাজবংশ, দুর্বৃত্ত দেবী সিংহ প্রতিষ্ঠা করলেন নসীপুরের রাজবংশ, এমন কি রাণী ভবানীর নিজ দেওয়ান দয়ারাম প্রতিষ্ঠা করলেন দিঘাপাতিয়ার রাজবংশ। শেষ পর্যন্ত রাণী ভবানী এমন নিঃস্ব হয়ে গেলেন যে

তাঁকে নির্ভর করতে হল কোম্পানি প্রদত্ত মাসিক এক হাজার টাকা বৃত্তির ওপর। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি করবার জন্য, তাঁর স্বজনদের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল ইংরেজ কোম্পানির কাছে। আর তার ললাটে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কালিমার টীকা। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১০ অকটোবর তারিখের (তাঁর মৃত্যুর তিন বছর আগে) এক সরকারী আদেশে বলা হল—"The former rank and situation of Maharanny Bowanny, her great age, and the distress to which both herself and the family have been reduced by the imprudence and misconduct of the Late Rajah of Rajesahy, are circumstances which give her claims to the consideration of Government. We therefore authorise to continue to her an allowance of Rs 1000 per month" অথচ তাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁর স্বজনবর্গ কোম্পানির দ্বারস্থ হল তখন কোম্পানীর রেভেন্যু বোর্ডের কর্তারা বললেন—"(Board) have reasons to suppose that the Late Ranny left ample funds by which the expenses of her funeral obsequies may be discharged".

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছিল বাঙালীর বিদ্রোহী মানসিকতার। এই সময়ের সব চেয়ে বড় বিদ্রোহ হচ্ছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এটা ঘটেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায়। এই বিদ্রোহেই আমরা এক মহিলাকে নেতৃত্ব করতে দেখি। সেই মহিলা হচ্ছে দেবী চৌধুরাণী। বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হচ্ছে ভবানী পাঠক। দুজনেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকায় ইংরেজদের কাছে অভিযোগ আসে যে ভবানী পাঠক নামে এক ব্যক্তি তাদের নৌকা লুঠ করেছে। ইংরেজরা তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে বন্দী করতে সক্ষম হয় না। ভবানী পাঠক ইংরেজদের দেশের শাসক বলে মানতে অস্বীকার করেন। দেবী চৌধুরাণীর সহায়তায় তিনি ইংরেজদের ওপর হামলা চালান। তার ফলে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। লেফটানেণ্ট ব্রেনোর নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজবাহিনী তাঁকে এক ভীষণ জলযুদ্ধে পরাজিত করে ও ভবানী পাঠক নিহত হন। উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিল ফকির সম্প্রদায়ের মজনু শাহ। মজনুর কার্যকলাপে উত্তরবঙ্গ, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় ইংরেজরা নাস্তানাবুদ হয়। সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে তাকে দমন করা সম্ভবপর হয় না। ভবানী পাঠকের সন্ন্যাসীর দলের সঙ্গে মজনুর ফকির দলের একবার সঙ্ঘর্ষ হলেও, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই নিজেদের কার্যকলাপ চালাত। তাদের কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত ছিল জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় করা, ইংরেজ সরকারের কোষাগার লুণ্ঠন করা ইত্যাদি। তবে জনসাধারণের ওপর তারা অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ করত না। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে মজনু পাঁচশত সৈন্যসহ বগুড়া জেলা থেকে পূর্বদিকে যাত্রা করবার পথে কালেশ্বর নামক জায়গায় ইংরেজবাহিনী কর্তৃক মারাত্মকভাবে আহত হয়। মজনুর দল বিহারের সীমান্তে পালিয়ে যায়। মাখনপুর নামক স্থানে মজনুর মৃত্যু হয়।

সন্ন্যাসীদের একজন মঠাধ্যক্ষ কৃপানাথের কথা আমরা আগেই বলেছি। বাইশ জন সহকারী সেনাপতিসহ তিনি রংপুরে ইংরেজবাহিনীদ্বারা ঘেরাও

হলে, তিনি বিপদ বুঝে নেপাল ও ভুটানের দিকে পালিয়ে যান।

উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা ছিলেন দর্পদেব। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে তিনি এক খণ্ড যুদ্ধ করেন।

কুচবিহারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন রামানন্দ গোঁসাই। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে দিনহাটা নামক স্থানে তাঁর বাহিনীর সঙ্গে লেফটানেন্ট মরিসনের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ইংরেজবাহিনীর তুলনায় অস্ত্রশস্ত্র স্বল্প ও নিকৃষ্ট থাকায় তিনি গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে মরিসনের বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। ইংরেজবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এই বিদ্রোহের শেষ পর্বের যাঁরা নায়ক ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় ইমামবাড়ী শাহ, বুদ্ধু শাহ, জহুরী শাহ, মুসা শাহ, সোভান আলি প্রমুখ। আরও একজন ছিলেন, তাঁর নাম জয়রাম। তিনি ছিলেন একজন এদেশীয় সুবেদার। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে সন্ন্যাসীবাহিনীর যে সংগ্রাম হয়, তাতে তিনি কয়েকজন সিপাইসহ সন্ন্যাসীদের সাহায্য করেছিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী পরাজিত হয়েছিল। জয়রাম কিন্তু ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। ইংরেজরা তাঁকে কামানের তোপে হত্যা করে।

ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা জহুরী শাহ-ও ধরা পড়ে। বিদ্রোহের অপরাধে তাকে ১৮ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্বের শ্রেষ্ঠতম নায়ক ছিল মুশা শাহ। তিনি ছিলেন মজনু শাহের যোগ্য শিষ্য ও ভ্রাতা। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে মজনুর মৃত্যুর পর তিনিই বিদ্রোহ অব্যাহত রাখেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করেন। সেখানে রাণী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনী তাঁর প্রতিরোধ করে। কিন্তু মুশা বরকন্দাজবাহিনীকে পরাজিত করেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে লেফ-টানেন্ট ক্রিষ্টির নেতৃত্বে এক ইংরেজবাহিনী মুশাকে আক্রমণ করে। ইংরেজ বাহিনী মুশার পশ্চাদ্ধাবন করেও তাঁকে বন্দী করতে পারে না। পরে ফেরাগুল শাহের নেতৃত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ্ব হয়, সেই দ্বন্দ্বে মুশা ফেরাগুলের হাতে নিহত হন।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের শেষ পর্বের অপর এক প্রধান নেতা ছিলেন সোভান আলি। এক সময় তিনি বাঙলা, বিহার ও নেপালের সীমান্ত জুড়ে এক বিরাট এলাকায় ইংরেজশাসক ও জমিদারগোষ্ঠীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। দিনাজপুর,

মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলায় ইংরেজ কুঠি ও জমিদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার সময় তাঁর সহকারী জহুরী শাহ ও মতিউল্লা ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পালিয়ে গিয়ে তিনি আমুদী শাহ নামে এক ফকির নায়কের দলে যোগ দেন। কিন্তু ইংরেজদের হাতে এ দল পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের পর ৩০০ অনুচর নিয়ে ১৭৯৭-১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় তিনি ছোট ছোট আক্রমণ চালান। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য ইংরেজ সরকার চার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। তাঁর শেষ জীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না।

শেষ পর্যন্ত ইমামবাড়ী শাহ ও বুদ্ধু শাহ বগুড়ার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড্ডীন রেখেছিলেন।

একদিকে যেমন 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' চলছিল, অপরদিকে তেমনই ইংরেজ-শাসক ও জমিদারগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে গণ-আন্দোলনও চলছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় চুয়াড় ও বাগড়ী নায়েক বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, ঘরুই বিদ্রোহ, হাতিখেদা বিদ্রোহ, বাখরগঞ্জের সুবান্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ, ত্রিপুরার রেজশনাবাদ পরগণায় সমশের গাড়ীর বিদ্রোহ ও শতাব্দীর শেষের দিকে তন্তুবায়দের ওপর ইংরেজ বণিকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তন্তুবায়দের বিদ্রোহ। এসব বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ যাঁরা জানতে চান, তাঁরা আমার 'প্রসঙ্গ পঞ্চবিংশতি' বইখানা পড়ে নিতে পারেন।

গ্রামীন সমাজ ও জীবনচর্যা

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজ জাতিভেদ প্রথার ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাতিবিন্যাসের শীর্ষদেশে ছিল ব্রাহ্মণ। তার নীচে ছিল নানান জাতি যথা বৈদ্য, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, গোয়ালা, তাম্বুলি, উগ্রক্ষেত্রী, কুম্ভকার, তিলি, যুগী, তাঁতি, মালি, মালাকার, কলু, নাপিত, রজক, দুলে, শাঁখারী, হাড়ি, মুচি, ডোম, চণ্ডাল, বাগদী, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, কর্মকার, সূত্রধর, গন্ধবেনে, জেলে, পোদ্দার, বারুই ইত্যাদি। তবে মধ্যযুগের সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মণরা সকল জাতির হাত থেকে জল গ্রহণ করতেন না। মাত্র নয়টি জাতি জল আচরণীয় জাতি বলে চিহ্নিত ছিল। এদের 'নবশাখ' বলা হত। এরা হচ্ছে তিলি, তাঁতি, মালাকার, সদ্‌গোগ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার ও ময়রা।

প্রতি জাতিরই এক একটা বিশেষ পেশা বা বৃত্তি ছিল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নেই বাঙালী তার কৌলিক বৃত্তি হারাতে আরম্ভ করে। এর আভাস আমরা পাই ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দের এক দলিল থেকে। ইংরেজরা আগে সূতীবস্ত্র সংগ্রহের জন্য দাদন দিত শেঠ-বসাকদের। শেঠ-বসাকরা ছিল তন্তুবায় গোষ্ঠীর লোক। কিন্তু ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা সূতী-বস্ত্রের জন্য কয়েকজন ভিন্ন জাতীয় লোককে দাদন দেয়। তাতে শেঠ-বসাকরা তাদের আপত্তি জানায়। তখন থেকেই ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে নাগরিক সমাজে বাঙালী তার জাতিগতবৃত্তি হারিয়ে ফেলে। কলকাতা শহরে এসে বাঙালী যে তার জাতিগত বৃত্তি হারিয়ে ফেলছিল তা ১৭৬৩ থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি বিভিন্ন জাতির লোককে নানারকম কারবার করবার জন্য যে লাইসেন্স দিয়েছিল, তা থেকেই প্রকাশ পায়। নানান জাতির লোক যে নানারকম ব্যবসায়ে লিপ্ত হচ্ছিল, তা আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ব্যবসাদারদের নাম থেকেও বুঝতে পারি। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শহরে বাঙলার জাতিসমূহের বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটছিল। তবে এই সময় কায়স্থসমাজের প্রসার ও প্রতিপত্তি লক্ষণীয়। এর কারণ, মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের 'জাত কাছারী'। কলকাতায় আগন্তুক অপরিচিত ও অজ্ঞাতকুলশীল অনেকেই সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য, 'জাত কাছারী'-র কাছে আবেদন করে

'কায়স্থ' স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এর ফলে, কলকাতার কায়স্থসমাজ বেশ প্রসারিত হয়ে উঠেছিল।

বাঙলার জাতিসমূহের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এগুলো অন্তর্বিবাহের (endogamous) গোষ্ঠী। তার মানে বাঙালীকে তার জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালী তার বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য হারালেও, তার এই সামাজিক বৈশিষ্ট্য হারায়নি। বিবাহ জাতির মধ্যেই হত। জাতির মধ্যে বিবাহ না দিলে, বাঙালীকে 'এক ঘরে' হতে হত। এক ঘরে হওয়া সেযুগে এক কঠোর সামাজিক শাস্তি ছিল। কেননা, তার নাপিত, ধোবা, পুরোহিত সব বন্ধ হয়ে যেত, এবং তার সঙ্গে কেউ সামাজিক আদানপ্রদান করত না।

দুই

বিবাহ সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে ছিল কৌলিন্য প্রথা। এটা প্রথমে ব্রাহ্মণ্যসমাজেই প্রবর্তিত হয়েছিল। পরে কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ প্রভৃতি সমাজেও প্রবর্তিত হয়। কৌলিন্য প্রথার ফলে নিজ জাতির মধ্যেই পরস্পরের আহার ও বৈবাহিক বিষয়ে নানারকম জটিল রীতিনীতি ও প্রথাপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল। সমাজে যাদের একবার কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হত, তারা বংশপরম্পরায় কুলীন বলে আখ্যাত হতেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে যাদের কুলীন করা হয়েছিল, তাঁরা হচ্ছেন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়। অনুরূপভাবে বঙ্গজ কায়স্থসমাজে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রদের কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। সদ্গোপ সমাজে শূর (সুর), নিয়োগী ও বিশ্বাস-রা কুলীন বলে পরিগণিত হতেন। সমজাতীয় সমাজে বিভিন্ন বংশকে উচ্চ ও নীচরূপে চিহ্নিত করে, এই প্রথা যে সমাজকে দুর্বল করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্রাহ্মণসমাজে এই প্রথাটি ছিল কন্যাগত। তার মানে, কুলীনের ছেলে কুলীন ছাড়া অকুলীনের মেয়েকেও বিবাহ করতে পারত। কিন্তু কুলীনের মেয়ের বিবাহ কুলীনের ছেলের সঙ্গেই দিতে হত। অকুলীনের সঙ্গে তার বিবাহ দিলে মেয়ের বাপের কৌলীন্য ভঙ্গ হত, এবং সমাজে তাকে হীন বলে মনে করা হত। সুতরাং কুলরক্ষার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণ পিতাকে যেনতেনপ্রকারেন কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়ে নিজের কুলরক্ষা করতে হত। তার কারণ অনূঢ়া কন্যা ঘরে রাখা বিপদের ব্যাপার ছিল। এক দিকে তো সমাজ তাকে একঘরে করত,

আর অপর দিকে ছিল যবনের নারী লোলুপতা। অনেক সময় যবনেরা নারীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে (এমন কি বিবাহমণ্ডপ থেকে) নিকা করতে কুণ্ঠা বোধ করত না।

সাধারণতঃ কুলীন ব্রাহ্মণগণ অগুনতি বিবাহ করত এবং স্ত্রীকে তার পিত্রালয়েই রেখে দিত। এরূপ প্রবাস-ভর্তৃক সমাজে কুলীন কন্যাগণ যে সব ক্ষেত্রেই সতী-সাবিত্রীর জীবন যাপন করত, সে কথা হলপ করে বলা যায় না। এর ফলে বাঙলার কুলীন সমাজে যে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, নারীর যবন দ্বারা ধর্ষিত হবারও সম্ভাবনা ছিল। যবনদূষিতা হবার শঙ্কাতেই বাঙালী সমাজে বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কৌলিন্য প্রথা বাঙালী সমাজকে ক্রমশ অবনতির পথেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। যে সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল ও মেয়ের বিবাহ কষ্টকর ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে সমাজে মেয়েকে অপসরণ করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পিতামাতার মনে জেগেছিল। সেজন্য গঙ্গা-সাগরের মেলায় গিয়ে মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে দেওয়াটা এদেশে একটা প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ সরকার আইন দ্বারা এই প্রথা বন্ধ করে দেয়। অনেকে আবার মেয়েকে সাগরের জলে ভাসিয়ে না দিয়ে, মন্দিরের দেবতার নিকট তাদের দান করতেন। মন্দিরের পুরোহিতরা এই সকল মেয়েদের নৃত্যগীতে পটীয়সী করে তুলতেন। এদের দেবদাসী বলা হত। এটাও বিংশ শতাব্দীতে আইনদ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তিন

কৌলিন্য প্রথাই অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে একমাত্র অপপ্রথা ছিল না। আরও ছিল সহমরণ ও দাসদাসীর কেনাবেচা। হিন্দুর মেয়েরা তো অনেকে স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হতেনই, এমন কি ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা কোথাও কোথাও অনুসৃত হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৌলিন্য-কলুষিত সমাজে এটা প্রায় বাধ্যতামূলক প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। সব-ক্ষেত্রেই যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অহিফেন সেবন করিয়ে তার প্রভাবে বা বলপূর্বক তাকে চিতায় চাপিয়ে পুড়িয়ে মারা

হত। নিজের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া সহমৃতা হওয়ায় রাজা রামমোহন রায় এরূপ ব্যথিত হয়েছিলেন যে নিষ্ঠাবান সমাজের বিরুদ্ধে একাকী খড়্গহস্ত হয়ে এই প্রথা লোপ করতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। তাঁরই চেষ্টায় তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে আইন প্রণয়ন দ্বারা এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দেন।

চার

দাসদাসী কেনাবেচা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তাদের ওপর গৃহপতির সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব থাকত। গৃহপতির অধীনে থেকে তারা গৃহপতির ভূমিকর্ষণ ও গৃহস্থালীর কাজকর্ম করত। সাধারণতঃ এদের হাট থেকে কেনা হত। দাসদাসীর ব্যবসাটা বিশেষভাবে চলত দুর্ভিক্ষের সময়। এটা যে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, তা নয়। চাষাভূষার ঘরেও দাসদাসী থাকত। সাধারণতঃ লোক দাসীদের সঙ্গে মেয়ের মত আচরণ করত। অনেকে আবার নিজের ছেলের সঙ্গে কোন দাসীর বিয়ে দিয়ে তাকে পুত্রবধূ করে নিত। তখন সে দাসত্ব থেকে মুক্ত হত। অনেকে আবার যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য দাসীদের ব্যবহার করত। এরূপ দাসীদের গর্ভজাত সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্মৃতিতে নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আগন্তুক ইংরেজরাও দাসদাসী কিনত ও খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তাদের বেচত।

পাঁচ

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজব্যবস্থায় পরিবার গঠিত হত যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবারের ভিত্তিতে। এই পরিবারের মধ্যে বাস করত স্বয়ং ও তার স্ত্রী, স্বয়ং-এর বাবা-মা, খুড়োখুড়ি, জেঠা-জেঠাই, তাদের সকলের ছেলে-মেয়েরা, স্বয়ং-এর ভাইয়েরা ও তাদের স্ত্রীরা ও ছেলেমেয়েরা এবং নিজের ছেলেমেয়েরা। অনেক সময় পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতো কোন বিধবা পিসি বা বোন বা অন্য কোন দুঃস্থ আত্মীয় ও আত্মীয়া। এরূপ পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই হতেন 'কর্তা' এবং পরিবারস্থ সকলেই তাঁর অধীনে থাকত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবারস্থ মেয়েদের বিবাহ আট দশ বছর বয়সেই হয়ে যেত। এরূপ বিবাহকে গৌরীদান বলা হত। মেয়েকে গৌরীদান করাই সকলের লক্ষ্য থাকত। আট পার হয়ে গেলে ন' বছর বয়সে যে বিবাহ হত,

তাকে রোহিনীদান বলা হত, আর দশ বছর বয়সে বিবাহকে বলা হত কন্যাদান। দশ পার হয়ে গেলে (কুলীনকন্যা ছাড়া), মেয়ের বাপকে একঘরে করা হত। সেজন্য সকলেই দশের মধ্যে মেয়ের বিবাহ দিত। বিয়ে সাধারণতঃ ঘটক বা ভাটের মাধ্যমে হত।

ছয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকের জীবনচর্যার ওপর দৈব ও অপদেবতার প্রভাব ছিল খুব বেশী। দৈনন্দিন জীবনে আধিব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঝাড়ফুঁক, মাদুলি, জলপড়া, গ্রহশান্তি ইত্যাদির আশ্রয় নিত।

তা ছাড়া, জ্যোতিষেরও প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। এবং যেহেতু সামাজিক জীবনে বিবাহই ছিল সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক সংস্কার সেজন্য বাঙালী পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় কোষ্ঠি-ঠিকুজিতে সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ বা সপ্তমাধিপতি কোন ঘরে আছে, তার বিচার করত। যদি সপ্তম ঘরে কোন পাপগ্রহ থাকত, তবে সে বিবাহ বর্জন করত। তারপর গণের মিল ও অমিলও দেখত।

বিবাহের পর আসত দ্বিরাগমন। তারপর মেয়েদের জীবনে পর পর ঘটত গর্ভাধান বা প্রথম রজোদর্শন, পুংসবন, পঞ্চামৃত, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি। এগুলো সবই ছিল আনন্দময় সামাজিক উৎসব, এবং এসব উৎসবই বাঙালীর লৌকিক জীবনকে সুখময় করে তুলত।

সন্তান প্রসবের পর শুরু হত স্বামী-স্ত্রীর ধর্মীয় জীবন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কুলগুরুর কাছ থেকে 'মন্তর' নিত। কেননা, মেয়েদের বিশ্বাস ছিল যে 'মন্তর' না নিলে দেহ পবিত্র হয় না। যারা 'মন্তর' নিত, তাদের প্রতিদিনই ইষ্টমন্ত্র জপ করতে হত। যাদের 'মন্তর' হত না, তাদের ঠাকুরঘরে যেতে দেওয়া হত না। এমন কি শ্বশুর-শাশুড়ীও তাদের হাতের জল শুদ্ধ বলে মনে করত না।

মেয়েরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করত। পঞ্চকন্যা হচ্ছে অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী। তারপর সদর দরজা থেকে শুরু করে বাড়ীর অন্দরমহল পর্যন্ত সর্বত্র গোবর জলের ছিটা দিত। এ ছাড়া, প্রতি বাড়ীতেই তুলসী-মঞ্চ থাকত এবং সন্ধ্যাবেলা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে দেওয়া হত।

শিশুকাল থেকে নানারকম ব্রত পালনের ভিতর দিয়েই মেয়েদের ধর্মীয় জীবন গড়ে উঠত। পাঁচ থেকে আট বছরের মেয়েরা নানারকম ব্রত করত। যেমন বৈশাখ মাসে শিবপূজা, পুণ্যিপুকুর ও গোকুল, কার্তিক মাসে কুলকুলতি, পৌষমাসে সোদর, মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি। আর সধবা মেয়েদের তো ব্রতের অন্ত ছিল না। সারা বছর ধরে দু-এক দিন অন্তর একটা না একটা ব্রত লেগেই থাকত। যেমন সাবিত্রী ব্রত, ফলহারিণী ব্রত, জয়মঙ্গলবারের ব্রত, বিপত্তারিণী ব্রত, নাগপঞ্চমী, ইতু পূজা, নীলের উপবাস, লুণ্ঠন ষষ্ঠী, চর্পটা ষষ্ঠী, রাধা অষ্টমী, তাল নবমী, অনন্ত চতুর্দশী, কাত্যায়নী ব্রত, শীতল ষষ্ঠী, অশোক ষষ্ঠী, অরণ্য ষষ্ঠী ইত্যাদি। এ ছাড়া, অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কলসী উৎসর্গ করত। বৈশাখ মাসে তুলসী মঞ্চে তুলসী গাছের ওপর জলের 'ঝারা' বাঁধত। কার্তিক মাসে 'আকাশ প্রদীপ' দিত। পৌষ সংক্রান্তিতে 'বাউনি' বাঁধত। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ঘটা করে 'অরন্ধন' করত। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে 'পৌষপার্বণ' ও ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে ঘণ্টাকর্ণ পূজা করত। নূতন শস্য উঠলে 'নবান্ন' করত। শীতল ষষ্ঠীর দিন আগের দিনে সিদ্ধকরা কড়াই সিদ্ধ খেত। চৈত্র সংক্রান্তিতে যবের ছাতু খেত। ভাদ্র মাস, পৌষ মাস ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা করত। অনেকে শিবের গাজন উপলক্ষে চৈত্র মাসে সন্ন্যাস গ্রহণ করত।

আঠারো শতকে বাঙালীর অসংখ্য পরব ছিল। অনেক পরবের নাম আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। ১১৯৪ বঙ্গাব্দের (১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক বিজ্ঞপ্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে নিম্নলিখিত পর্বের দিনসমূহে সরকারী কার্যালয়সমূহ বন্ধ থাকত—অক্ষয় তৃতীয়া ১দিন, নৃসিংহ চতুর্দশী ২দিন, জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমী-একাদশী ২দিন, স্নানযাত্রা ১দিন, রথযাত্রা ১দিন, পূর্ণযাত্রা ১দিন, জন্মাষ্টমী ২দিন, শয়ন একাদশী ১দিন, রাখীপূর্ণিমা ১দিন, উত্থান একাদশী ২দিন, অরন্ধন ১দিন, দুর্গাপূজা ৮দিন, তিলওয়া সংক্রান্তি ১দিন, বসন্ত পঞ্চমী ১দিন, গণেশ পূজা ১দিন, অনন্ত ব্রত ১দিন, বুধনবমী ১দিন, নবরাত্রি ১দিন, লক্ষ্মীপূজা ১দিন, অন্নকুট ১দিন, কার্তিক পূজা ১দিন, জগদ্ধাত্রী পূজা ১দিন, রাসযাত্রা ১দিন, অগ্রহায়ণ নবমী ১দিন, রটন্তী অমাবস্যা ২দিন, মৌনী সপ্তমী ১দিন, ভীমাষ্টমী ১দিন, বাসন্তী পূজা ৪দিন, শিবরাত্রি ২দিন, দোলযাত্রা ৫দিন, বারুণী ১দিন, চড়কপূজা ১দিন, ও রামনবমী ১দিন। এছাড়া গ্রহণাদির দিনও ছুটি থাকত। গ্রহণের দিন লোক হাঁড়ি ফেলে দিত। রান্নার জন্য

আবার নূতন হাঁড়ি ব্যবহার করত। তা ছাড়া গ্রহণের পর সাতদিন অযাত্রা বলে গণ্য হত। এই সকল পূজাপার্বণ উপলক্ষে বাঙালী মেয়েরা সুযোগ পেত, তাদের শিল্পমননকে ক্রীয়াশীল করত নানারকম বিচিত্র আলপনা অঙ্কনে। বিবাহ উপলক্ষে বরকনের পিঁড়ের ওপর অঙ্কিত আলপনাগুলোও দেখবার মত হত।

পরবের দিনসমূহে লোক গঙ্গাস্নান বা নিকটস্থ কোন পবিত্র পুষ্করিণীতে স্নান করত। বড় বড় পরব উপলক্ষে এই সব জায়গায় মেলা বসত। ভদ্রসম্প্রদায়ের মেয়েরা ওই সব মেলায় সুযোগ পেত নিজেদের মনোমত গৃহস্থালীর জিনিষপত্তর কেনবার।

সাত

পুরুষরা মাঠে-ঘাটে, হাটে ব্যস্ত থাকত। আর মেয়েরা ঘরকন্নার কাজ করত। ঘরকন্নার কাজের মধ্যে একটা প্রধান কাজ ছিল রান্নাবান্না করা ও অবসর সময়ে সুতাকাটা ও প্রদীপের সলতে পাকানো। তা ছাড়া তারা পান সাজত ও নানারকম নকসাওয়ালা কাঁথা সেলাই করত। ডালের বড়ি দিত। মুড়ি ভাজত ও মুড়কি তৈরী করত। নারিকেল দিয়ে নানারকম মিষ্টান্ন তৈরী করত। এ সব জলখাবার হিসাবে ব্যবহৃত হত। রান্নাবান্না হত কাঠের আগুনে, কেননা কয়লা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওঠেনি। মাটির হাঁড়িতেই ভাত ডাল রান্না হত। খাওয়া-দাওয়া হত পাথরের ও কাঁসার থালা-বাসনে। লোক কাঠের পিঁড়া বা আসনের ওপর বসে খাওয়া-দাওয়া করত। বিধবাদের জন্য আলাদা রান্না হত, হয় ভিন্ন উনুনে নয় অন্য উনুন ন্যাতা-গোবর বুলিয়ে শুদ্ধ করে। এ সম্বন্ধে শুচিতা খুব কঠোর ছিল। খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আগেকার দিনের রঘুনন্দনের বিধান অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। কেননা, ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরা আসবার পর বাঙালী তার গৃহস্থালীতে পর্তুগীজদের আনীত অনেক আনাজ-তরকারী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীকে স্থান দিয়েছিল। সেগুলো বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দের প্রাচুর্য থেকে বুঝতে পারা যায়। সে সব দ্রব্যসামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—আলু, তামাক, বজরা, সাগু, কাজু বাদাম, আনারস, আতা, আমড়া, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, আচার, আরক, ভাঙ, বুগুল, চা, কোকো, কাবাব, রাসন, বিসকুট, জোলাপ ইত্যাদি। আরও যে সব পর্তুগীজ শব্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর

বাঙালী ব্যবহার করত, সেগুলো হচ্ছে—আয়া, আলমিরা, বালতি, বাট্টা, বুটিক, কামরা, কামিজ, চাবি, গুদাম, ঝিলমিলি, লস্কর, নিলাম, মিস্ত্রি, পাদরী, পালকি, পমফ্রেট, পিওন, রসিদ, বারাণ্ডা, আলকাতরা, ভাপ, বয়া, বোতাম, বোতল, কেদারা, কাফি, কাস্ত্রি, কাকাতুয়া, কামান, ছাপ, কৌচ, কম্পাস, ইস্পাত, ইস্ত্রি, ফিতা, ফর্মা, গরাদ, জানালা, লাণ্টার্ণ, মাস্তল, মেজ, পিপা, পিরিচ, পিস্তল, পেরেক, রেস্ত, সাবান, টোকা, তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা ইত্যাদি।

আট

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর। নদীমাতৃক বঙ্গভূমি উৎপন্ন করত প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য। এই সকল কৃষিজাত পণ্য বাঙলার নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে বিক্রীত হত দেশ-দেশান্তরের হাটে। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল চাউল, তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ, সুপারি, আদা, লঙ্কা, কলা ও অন্যান্য নানাবিধ ফল। পরে পাট ও নীলের চাষও প্রভূত পরিমাণে হত। শতকরা ৯৯ জন লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকত। কৃষিকে হীনকর্ম বলে কেউ মনে করত না। এমন কি ব্রাহ্মণরাও কৃষিকর্ম করতে লজ্জাবোধ করত না। তবে দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝে সুজলা, সুফলা বাঙলার জনজীবনকে বিপন্ন করত। এরূপ বিপর্যয় চরমে উঠেছিল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়।

শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল কার্পাস ও রেশমজাত বস্ত্র। সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুতের জন্য বাঙলার প্রসিদ্ধি ছিল। এরূপ বস্ত্র বয়নের জন্য প্রতি ঘরে ঘরে মেয়েরা সুতা কাটত। দেশবিদেশে বাঙলার বস্ত্রের চাহিদা ছিল। বাঙলার শর্করার প্রসিদ্ধিও সর্বত্র ছিল। এছাড়া বাঙলায় প্রস্তুত হত শঙ্খজাত নানারূপ পদার্থ, লৌহ, কাগজ, কালি, লাক্ষা, কৃষিকর্মের জন্য নানারূপ যন্ত্রপাতি, বারুদ ও ও বরফ। বীরভূমের নানাস্থানে ছিল লৌহপিণ্ডের আকর। তা থেকে লৌহ ও ইস্পাত তৈরী হত। বীরভূমের যে সকল স্থানে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ছিল, সেগুলি হচ্ছে দামরা, ময়সারা, দেওচা ও মহম্মদনগর। এই সকল লোহা দিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত কলকাতা ও কাশিমবাজারে কামান তৈরী হত। লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য বীরভূমের কারিগরগণ নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন করত। বরফ তৈরীর জন্যও বাঙলার নিজস্ব প্রণালী ছিল। শীতকালে

মাটিতে গর্ত করে, তার মধ্যে গরম জল ভরতি করে সমস্ত রাত্রি রাখা হত। প্রভাতে তা বরফে পরিণত হত। এছাড়া, চিনি তৈরীর জন্যও বাঙলার নিজস্ব পদ্ধতি ছিল। এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে চিনি তৈরী হত তা ধবধবে সাদা। এই চিনি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হত। এছাড়া, বাঙলার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল পালকি ও নৌকা নির্মাণে। এই সকল নৌকা দেশের মধ্যে নদীপথে পরিবহণের কাজে ও সমুদ্রপথে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত। তা ছাড়া মৎসজীবীরা এই সকল নৌকার সাহায্যে সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে মাছ ধরত। বাঙলার মৃৎশিল্পেরও যথেষ্ট উৎকর্ষতা ছিল। মৃৎশিল্পীরা হাঁড়িকলসী, পুতুল, প্রতিমা ও মন্দিরগাত্রের মৃৎফলকসমূহ তৈরী করত। মৃৎশিল্পে নাটোরের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। পরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নাটোর থেকে কয়েকজন মৃৎশিল্পী এনে কৃষ্ণনগর ঘরানার পত্তন করেছিলেন।

খাগড়া, নলহাটি ও দাঁইহাটা কাঁসার বাসন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কাঁসারিরা ছাঁচে ঢালা বা চাদর পেটাই করে কুঁদে নানারকম বাসন তৈরী করত, যথা ধান মাপবার কুনকে, পিতলের প্রদীপ, পিলসুজ ইত্যাদি।

নয়

বাণিজ্য বাঙালীর সমৃদ্ধির একটা প্রধান সূত্র ছিল। এজন্য বণিক সমাজের ধনাঢ্যতা প্রবাদবাক্যে দাঁড়িয়েছিল। এই বণিকসমাজই কলকাতা নগরীর গোড়াপত্তন করেছিল। মাত্র নবাগত বিদেশীরাই যে বাঙলার হাট থেকে মাল কিনত, তা নয়। ভারতের নানা স্থান থেকে ব্যবসায়ীরা বাঙলার হাটে মাল কিনতে আসত। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাশ্মীরী, মুলতানী, আফঘান, পাঠান, শেখ, পগেয়া, ভুটিয়া ও সন্ন্যাসীরা। সন্ন্যাসীরা যে কারা, তা আমরা সঠিক জানি না। মনে হয় তারা হিমালয়ের সানুদেশ থেকে চন্দন কাষ্ঠ, মালার গুটি ও ভেষজ গাছগাছড়া বাঙলায় বেচতে আসত। তার বিনিময়ে তারা বাঙলা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যেত। হলওয়েলের এক বিবরণী থেকে আমরা জানতে পারি যে দিল্লী ও আগরা থেকে পগেয়ারা বর্ধমানে এসে প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র, সীসা, তামা, টিন ও লঙ্কা কিনে নিয়ে যেত। আর তার পরিবর্তে তারা বাঙলায় বেচে যেত আফিম, ঘোড়া ও সোরা। অনুরূপভাবে

কাশ্মীরের লোকেরা বাঙলা থেকে কিনে নিয়ে যেত লবণ, চামড়া, নীল, তামাক, চিনি, মালদার সাটিন কাপড় ও বহুমূল্য রত্নসমূহ। এগুলি তারা বেচত নেপাল ও তিব্বতের লোকদের কাছে।

বাঙলার বাহিরের ব্যবসায়ীরা যেমন বাঙলায় আসত, বাঙলার ব্যবসায়ীরাও তেমনই বাঙলার বাহিরে যেত। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে জয়নারায়ণ কর্তৃক রচিত 'হরিলীলা' নামক এক বাংলা বই থেকে আমরা জানতে পারি যে বাঙলার একজন বণিক ব্যবসা উপলক্ষে হস্তিনাপুর, কর্নাট, কলিঙ্গ, গুর্জর, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, ভোজ, পঞ্চাল, কম্বোজ, মগধ, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন ও কামরূপ প্রভৃতি দেশে গিয়েছিলেন।

যারা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকত, তারা বেশ দু'পয়সা রোজগার করে বড়লোক হত। তাদের ধনদৌলত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। ধনীলোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী সাধারণ লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তাদের পোশাক-আশাক ও অলঙ্কার দেখে বিদেশীরা আশ্চর্য হয়ে যেত। গৌড় ও পূর্ববাঙলার ধনীলোকেরা সোনার থালা-বাটিতে আহার করত। মাত্র এক শতাব্দী আগে সপ্তদশ শতাব্দীতে ফিরিস্তা মন্তব্য করেছে যে কোনও বড়লোকের ঘরে কত-সংখ্যক সোনার থালা-বাসন আছে, সেটাই ছিল তার ধনাঢ্যতার মাপকাটি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জিনিষপত্তরের দাম খুব সুলভ ছিল। ১৭২৯ খ্রীস্টাব্দের এক মূল্য তালিকায় আমরা মুরশিদাবাদে প্রচলিত যে দাম পাই, তা থেকে জানতে পারি যে প্রতি টাকায় মুরশিদাবাদে পাওয়া যেত সরু চাল এক মন দশ সের থেকে এক মন পনেরো সের পর্যন্ত, দেশী চাল চার মন পঁচিশ সের থেকে সাত মন কুড়ি সের পর্যন্ত, গম তিন মন ৩০ সের, তেল ২১ সের থেকে ২৪ সের, ঘি দশ সের আট ছটাক থেকে ১১ সের ৪ ছটাক, ও তুলা দুই মন থেকে দুই মন ৩০ সের।

কিন্তু এই সুলভতা সত্বেও ছিল নিম্নকোটির লোকদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণ ছিল সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার ও জুলুম। রাজস্ব দিতে না পারলে যে কোন হিন্দুর স্ত্রী ও ছেলেপুলেকে নীলাম করে বেচে দেওয়া হত। এছাড়া, সরকারী কর্মচারীরা যখন তখন কৃষক রমণীদের ধর্ষণ করত। এর কোন প্রতিকার ছিল না। তার ওপর ছিল যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যগণের অত্যাচার

ও বাঙলার দক্ষিণ অংশের উপকূলভাগে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের উপদ্রব। তারা যে মাত্র লুটপাট করত ও গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিত, তা নয়, মেয়েদের ধর্ষণ করত ও অসংখ্য নরনারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের দাসদাসীর হাটে বেচে দিত। আরও ছিল বিদেশী বণিকদের অত্যাচার। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—'উদাসীন ব্যাপারী বিদেশী যাবে পায়। লুটে লয়ে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায়॥' এটা ছিল শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পরিস্থিতি।

দশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ইংরেজ গ্রাম-বাঙলার আর্থিক জীবনকে ধ্বংস করেছিল। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিরেকটররা এখানকার কর্মচারীদের আদেশ দেন—'বাঙলার রেশম বয়ন-শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র রেশম উৎপাদনের ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা হউক।' শীঘ্রই অনুরূপ নীতি তুলাজাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজ এখান থেকে কাঁচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগল, আর সেই কাঁচা-মাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বাঙলায় এনে বেচতে লাগল। বাঙলা ক্রমশ গরীব হয়ে পড়ল। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ থেকে সাহেবরা নীলচাষে লিপ্ত হল। দরিদ্র কৃষকদের ওপর অত্যাচারের এটা এক যন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। Percival Spear বলেছেন—"Bengal sank from a state of fabled prosperity to rural misery".

ইংরেজ একদিকে যেমন বাঙলার গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলল, অপর দিকে তেমনই শহরে ও তার আশপাশে গড়ে তুলল এক নূতন সমাজ। সে সমাজের অঙ্গ ছিল ব্যবসাদার, ঠিকাদার, দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুনসী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমাজ জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। এর ফলে গ্রামীন সমাজজীবন (যেখানে শতকরা ৯৯ জন বাস করত) সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ল। তারপর বামালোভী সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের দল এনে দিল গ্রামীন জীবনে এক গুকারজনক নৈতিক শৈথিল্য।

এগারো

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য দেব-দেউল। এগুলির মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী ছিল শিবমন্দির। শিবমন্দিরগুলি সাধারণতঃ 'আটচালা' মন্দিরের আকারেই তৈরী হত। তবে স্থানে স্থানে শিবমন্দির 'রত্ন' মন্দিরের আকারেও নির্মিত হত। অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির 'রত্ন' ও 'দালান' রীতিতেই তৈরী হত। এসব মন্দিরের দেবদেবীর মধ্যে ছিল কালী, দুর্গা, সিংহবাহিনী, অন্নপূর্ণা, বিশালাক্ষী, রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি। এসব দেবদেবীর মন্দিরগাত্র শোভিত করা হত পোড়ামাটির অলঙ্করণ দ্বারা। (পরবর্তী 'মঠ, মন্দির ও মসজিদ' অধ্যায় দেখুন)। এ সব দেবদেবী থেকে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোকের উপাসনা পদ্ধতির একটা পরিচয় পাই। শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে 'কর্তাভজা' নামে এক নূতন ধর্মসম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটেছিল। এঁরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যুক্তসাধনার বাণী প্রচার করেছিলেন। এঁদের ধর্মের নাম ছিল 'সত্যধর্ম'। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আদিগুরু ছিল আউলচাঁদ। আউলচাঁদের মৃত্যুর পর দল ভাঙতে শুরু করে। প্রধান দলের কর্তা রামশরণ পালই 'সত্যধর্ম' প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তী উনিশ শতকে কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও অভিজাত পরিবার রামশরণ পাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সত্যধর্ম'-এর অনুগামী ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরও দু'টা ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল। একটা হচ্ছে নদীয়া মেহেরপুরের 'বলরামভজা' সম্প্রদায়, ও অপরটি সুসঙ্গ পরগনার বাউলধর্মী 'পাগলপন্থী' সম্প্রদায়। বলরামের শিষ্যরা তাঁকে রামচন্দ্রের অবতার বলত। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মত এ সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথা ছিল না। সম্প্রদায়টি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) গৃহী, ও (২) ভিক্ষোপজীবী। পাগলপন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ফকির করম শা। গারো ও হাজংদের তিনি সাম্যভাবমূলক ও সত্যসন্ধানী বাউলধর্মে দীক্ষিত করেন। 'পাগলপন্থী' নামটা ইংরেজদের দেওয়া। এ সম্প্রদায় পরে জমিদারশ্রেণীর শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল।

সাহিত্যে জনজীবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর জনজীবনের এক বিশ্বস্ত চিত্র আমরা পাই সমসাময়িক সাহিত্য থেকে। আগেই বলেছি যে বাঙলার সমৃদ্ধি নির্ভর করত তার কৃষির ওপর। সেজন্য সবজাতের লোকই কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকত। জনজীবনে কৃষির এই গুরুত্বের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য যখন তাঁর 'শিবায়ন' কাব্য রচনা করলেন, তখন তিনি শিবঠাকুরকে বাঙলার কৃষক সমাজেরই একজন মানুষ হিসাবে চিত্রিত করলেন।

রামেশ্বরের আদিবাড়ি ছিল যদুপুরে। কিন্তু সেখান থেকে শোভাসিংহের ভাই হেমতসিংহ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে, তিনি আশ্রয় নেন কর্ণগড়ের রাজা রাম-সিংহের। সেখানে তিনি রামসিংহের সভাসদ ও পুরাণপাঠক হন। পরে রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহ তাঁকে সভাকবির সম্মান দেন। তাঁরই নির্দেশে তিনি 'শিবায়ন' বা 'শিবকীর্তন' কাব্য রচনা করেন।

রামেশ্বরের কাব্যে শিব কৃষক, শিবানী কৃষক-পত্নী। বাঙলার অন্য কৃষকদের মত শিবও শুভদিনে চাষ আরম্ভ করেন। জমি চৌরস করেন, আল বাঁধেন। বীজ বপন করেন। তারপর বীজগুলি বেরুতে আরম্ভ করে। বর্ষার জল পেয়ে ধানের পাশে আরও নানারকম গাছপালা জন্মায়। তখন শিব নিড়ানের কাজ আরম্ভ করেন। বর্ষার সঙ্গে জোঁক মশা মাছির উপদ্রব বাড়ে। কিন্তু তা বলে তো কাতর হয়ে চাষী চাষ বন্ধ রাখে না। শিবও বিরত হন না। ধানগাছের মাত্র মূলটুকু ভিজা থাকবে, এমন জল রেখে বাকী জল নালা কেটে, ভাদ্র মাসে ক্ষেত থেকে বের করে দেন। আবার আশ্বিন-কার্তিকে ক্ষেতে জল বাঁধেন। এর মধ্যে ডাক-সংক্রান্তি এসে পড়ে। শিব ক্ষেতে নল পুতেন। দেখতে দেখতে সোনালী রঙের ধান দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শিবের আনন্দ ধরে না। দেখতে দেখতে পৌষ মাসে ধান কাটার সময় আসে। শাঁখ বাজিয়ে গৌরী ধান ঘরে তুলেন। সবশেষে রামেশ্বর দিয়েছেন বাঙালী কৃষক গৃহস্থের মত নবান্নে ও পৌষপার্বণে শিবের দুই ছেলের সঙ্গে ভোজনের এক মধুময় আনন্দ চিত্র।

অন্য কৃষকপত্নীদের মত গৌরীও শিব ঠাকুরকে খাবার দিতে মাঠে যায়। গৌরীকে দেখে শিবঠাকুর হাল ছেড়ে দিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করেন—'কি গো

খাবার আনতে এত দেরী কেন ?' গৌরী বলে—'ছেলেপুলের সংসার এক হাতে সব করতে গেলে এমনই হবে।' কথায় কথা বাড়ে। ক্ষুধিত শিব গৌরীর চুল ধরে টানে। শিব রুষ্ট হয়ে বলে—'ক্ষেমা কর ক্ষেমঙ্করি খাব নাঞি ভাত। যাব নাঞি ভিক্ষায় যা করে জগন্নাথ।' আবার অন্য সময় শিব আদর করে গৌরীর হাতে শাঁখাও পরিয়ে দেন।

রামেশ্বর অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন গৌরীর স্বামীপুত্রকে খাওয়ানোর—'তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটি সুতে সপ্তমুখ, পঞ্চমুখ পতি॥ তিন জনে বার মুখে পাঁচ জনে খায়। এই দিতে এসে নাঞি হাড়ি পানে চায়॥ সুক্ত খায়্যা ভোক্তা যদি হস্ত দিল শাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আনে রুদ্রমূর্তি ডাকে॥ কার্তিক গণেশ বলে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য হইয়া খা॥ উষ্মন চর্বণে ফিরা্যা ফুরাইল ব্যঞ্জন। এক কালে্য শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥ চটপট পিষিত মিশ্রিত করা্যা যুষে। বায়ুবেগে বিধুমুখী বাস্ত হইয়া আসে॥ চঞ্চল চরণেতে নুপুর বাজে আর। রিনি রিনি কিঙ্কিনী কঙ্কন ঝঙ্কার॥'

বাঙালী ঘরের গৃহিণী হিসাবে গৌরীকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়। মা মেনকা গৌরীকে বিশ্রাম দেবার জন্য বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে চান। কিন্তু শিবের মর্যাদাজ্ঞান খুব বেশী। মাত্র তিন দিনের কড়ারে শিব গৌরীকে বাপের বাড়ী পাঠান।

গৌরীর বিবাহপূর্ব জীবনও রামেশ্বরের কাব্যে খুব মধুর। আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মত গৌরী পুতুল খেলা করে। পুতুলের বিয়ে দেয়। নিজের সখীদের পুতুলের বিয়েতে বিকল্প ভোজন করায়। অন্য বাঙালীর মেয়ের মত গৌরীর বিয়েতেও ঘটকের প্রয়োজন হয়। ভাগনে নারদই মামার বিয়েতে ঘটকালী করে। বিয়েতে পালনীয় সব কর্মই অনুষ্ঠিত হয়। এয়োরা আসে, কন্যা সম্প্রদান হয়, যৌতুকও বাদ যায় না। রামেশ্বর এয়োদের যে নামের তালিকা দিয়েছেন, তা থেকে আমরা তৎকালীন মেয়েদের নামের নমুনা পাই। তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেমন কবিরা পতিনিন্দার অবতারণা করেছেন, রামেশ্বর তা করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি শাশুড়ীদের মুখ দিয়ে জামাতাদের নিন্দা প্রকাশ করেছেন। রামেশ্বরের কাব্যের এই অংশ অত্যন্ত কৌতুকাবহ।

দুই

রামেশ্বর বাঙলার পারিবারিক জীবনের যে সুখময় চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতির অন্তরালে, বাঙলায় যে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতা প্রকাশ পেয়েছিল, তার প্রতিঘাতে বাঙলার সমাজ ও পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত হয়েছিল। সে চিত্র আমরা পাই শতাব্দীর মধ্যাহ্নে রচিত ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এ। একটা কামলালসাচ্ছন্ন সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল, যে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই নৈতিকশৈথিল্যের নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল। সে সমাজের নারী বলছে—'বৎসর পনের ষোল বয়স আমার। ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার।' আবার কবির উক্তি—'পরকীয় রস যত, ঘরে ঘরে শুনি কত, অভাগীর ধর্ম ভয় এত করে মরি লো। পরপুরুষের মুখ হেরিলে যে হয় সুখ। এ কি জ্বালা সদা জ্বলি হরি হরি লো।' সাধারণ লোকের ঘরেই যে এরূপ ঘটত তা নয়। রাজা রাজড়ার ঘরেও ঘটত। অনূঢ়া অবস্থাতেই অনেকে অন্তস্বত্বা হত। নায়িকা বিদ্যাই তার দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের ন্যায় মেয়েদের পতিনিন্দা, এয়োদের নামের তালিকা, রন্ধনে নানা পদের ব্যঞ্জনের ফর্দ (পাঁপড় ও লুচি সমেত), জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন, বিবাহে নানারূপ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির উল্লেখও আমরা 'বিদ্যাসুন্দর'-এ পাই।

ভারতচন্দ্র বর্ধমান শহরের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। 'দেখি পুরী বর্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান, ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ। রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর, ভাল বটে জানিনু বিশেষ॥ চৌদিকে সহরপনা, দ্বারে চৌকী কত জনা, মুরুচা বুরুজ শিলাময়। কামানের হুড়হুড়ি, বন্দুকের দুরদুরি, সলখে বানের গড় হয়॥ বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল, নৌবত ঝাঁঝের রোল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি॥" বর্গীর হাঙ্গামা সম্বন্ধেও তাঁর উক্তি আগে দ্রষ্টব্য। গ্রাম্য-ব্যবসায়ীদের ওপর ইংরেজ বণিকদের লুণ্ঠন ও পীড়নের কথাও তিনি বলেছেন—'উদাসীন ব্যাপারী বিদেশী যারে পায়। লুটেপুটে বেড়ি দিয়া ফাটকে ফেলায়।' আবার কুলীন বনিতাদের বিষাদময় জীবনের চিত্রও দিয়েছেন—'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে। যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥ যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই। বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥ বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে

বাদ লাগে। পুনর্বিয়া হবে কিনা বিয়া হবে আগে॥ বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটিবাটি। জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি॥ দুচারি বংসরে যদি আসে একবার। শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥ সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়। তবে মিষ্টি মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥'

তিন

পারিবারিক জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, ও সমাজজীবনে রাজ-কর্মচারীদের অত্যাচার ও নির্যাতন ও ইংরেজের লুণ্ঠন ও শোষণ প্রভৃতির প্রতিক্রিয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের মন ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এর প্রকোপে শতাব্দীর শেষভাগে নানা বিদ্রোহ ঘটেছিল। লৌকিক ছড়ার মাধ্যমে জনগণ এই সব বিদ্রোহ সম্বন্ধে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করেছিল। দেবী সিংহ-এর অত্যাচার সম্বন্ধে এক ছড়ায় বলা হয়েছে—'কত যে খাজনা পাইবে তার লেখা নাই। যত পারে তত নেয়, আরো বলে চাই। দেও দেও ষাই যাই একমাত্র বোল। মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল।' 'মানীর সম্মান নাই, মানী জমিদার। ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার। সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা। দেবী সিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা।' 'পারে না ঘাটায় চলতে ঝিউরী বউরী। দেবী সিংহ-এর লোক তাকে নেয় জোর করি। পূর্ণ কলি অবতার দেবী সিংহ রাজা। দেবী সিংহ-এর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা।' মজনুর বিদ্রোহ ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে হলেও, ছড়ায় মজনুর ফকির সম্প্রদায় কর্তৃক নারী ধর্ষণের ভীষণ অভিযোগ আনা হয়েছে—'ভাল ভাল মানুষের কুলবধূ জঙ্গলে পলায়। লুটুরা ফকির যত পাছে পাছে ধায়। যদি আসে লাগপাস জঙ্গলের ভিতর। বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর। বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন। যুবতি কাকুতি করে নাহি শুনে করয়ে শিঙ্গার।' আবার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্বন্ধে ছড়ায় বলা হয়েছে—'পৌষ মাসের সোমবার অমাবস্যার ভোগ। মূলা নক্ষত্রতে পাইল নারায়ণী যোগ। মঙ্গলবারের দিন আইল ছয়শত সন্ন্যাসী। তারা কাশীবাসী মহাঋষি উর্দ্ধবাহুর ঘটা। সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়ে গেল শঙ্কা। হাজারে হাজারে বেটারা লুট করিতে আসে।' যদিও বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ'-এ আমরা এর অন্য চিত্র পাই

শিক্ষা ও পণ্ডিতসমাজ

সার্বজনীন স্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজে শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম ছিল হিন্দুদের পাঠশালা ও মুসলমানদের মকতাব। এ ছাড়া ছিল কথকতা গান, যাত্রাভিনয় ও পাঁচালী গান যার মাধ্যমে হিন্দুরা পৌরাণিক কাহিনীসমূহের সঙ্গে পরিচিত হত। পাঠশালায় ছেলেমেয়ে উভয়েই পড়ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা লেখাপড়া করে বিদুষী হতেন, তা আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা থেকে জানতে পারি। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর'-এর নায়িকা বিদ্যা তো বিদ্যারই মূর্তিময়ী প্রতীক ছিল। রাণী ভবানীও বেশ সুশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। বর্ধমানের রাজপরিবারের মেয়েরাও সুশিক্ষিতা ছিলেন। তবে মেয়েদের মধ্যে দু-চারজন উচ্চশিক্ষিতা হলেও সাধারণ মেয়েরা অল্পশিক্ষিতাই হত। এর প্রধান কারণ ছিল বাল্যবিবাহের প্রচলন।

উচ্চশিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল মুসলমানদের ক্ষেত্রে মৌলবীগণ পরিচালিত মাদ্রাসা ও হিন্দুদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরিচালিত চতুষ্পাঠীসমূহ। পাঠশালার সঙ্গে চতুষ্পাঠীর প্রধান পার্থক্য ছিল এই যে, পাঠশালা যে কোন জাতির লোক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারতেন, কিন্তু চতুষ্পাঠিসমূহ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই পরিচালনা করতেন। চতুষ্পাঠীসমূহে নানা শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হত। চতুষ্পাঠীসমূহের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। শাস্ত্র অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। এই প্রসিদ্ধির জন্যই নবদ্বীপকে বাঙলার 'অকস্‌ফোর্ড' বলে অভিহিত করা হত। নব্যন্যায় ও স্মৃতির অনুশীলনের জন্য নবদ্বীপ বিশেষভাবে খ্যাত ছিল। তবে নবদ্বীপই একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্র ছিল না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পীঠস্থান হিসাবে পূর্ববঙ্গে কোটালিপাড়ার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য ত্রিবেণী, কুমারহট্ট (কামারহাটি), ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া), গোন্দলপাড়া (চন্দ্রনগর), ভদ্রেশ্বর, জয়নগর-মজিলপুর, আন্দুল, বালী, বর্ধমান প্রভৃতিরও প্রসিদ্ধি ছিল। দ্রাবিড়, উৎকল, মিথিলা ও বারাণসী থেকে দলে দলে ছাত্র বর্ধমানের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে আসত। এই সকল চতুষ্পাঠীতে যে মাত্র নব্যন্যায় বা স্মৃতিশাস্ত্রেরই অনুশীলন হত, তা নয়। জ্যোতিষ,

আয়ুর্বেদ, ন্যায়, কোষ, নাটক, গণিত, ব্যাকরণ, ছন্দোসূত্র প্রভৃতি ও দণ্ডী, ভারবী, মাঘ, কালিদাস, প্রমুখদের কাব্যসমূহ এবং মহাভারত, কামন্দকী-দীপিকা, হিতোপদেশ প্রভৃতি পড়ানো হত।

দুই

চতুষ্পাঠীতে যে মাত্র পুরুষেরাই পড়ত, তা নয়। মেয়েরাও কেউ কেউ চতুষ্পাঠীতে পড়ে বিদুষী হত। তাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চসোপানে উঠেছিল। যেমন পশ্চিমবঙ্গের হটি বিদ্যালঙ্কার ও হটু বিদ্যালঙ্কার, এবং পূর্ব-বঙ্গের বিক্রমপুরের আনন্দময়ী দেবী ও কোটালিপাড়ার বৈজয়ন্তী দেবী। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধা ছিলেন হটি বিদ্যালঙ্কার। তিনি ছিলেন রাঢ়দেশের এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা। সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি ও নব্যন্যায়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে বারাণসীতে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করেছিলেন। বেশ বৃদ্ধ বয়সে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান। হটু বিদ্যালঙ্কারের আসল নাম রূপমঞ্জরী। তিনিও রাঢ়দেশের মেয়ে ছিলেন, তবে তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁর পিতা নারায়ণ দাস অল্প বয়সেই মেয়ের অসাধারণ মেধা দেখে, তাঁর ১৬।১৭ বছর বয়সকালে তাঁকে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে অধ্যয়ন করে রূপমঞ্জরী ব্যাকরণ, সাহিত্য আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। নানা জায়গা থেকে ছাত্ররা তাঁর কাছে ব্যাকরণ, চড়কসংহিতা, নিদান ও আয়ুর্বেদের নানা বিভাগের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে আসত। অনেক বড় বড় কবিরাজ তাঁর কাছে চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসতেন। রূপমঞ্জরী শেষপর্যন্ত অবিবাহিতাই ছিলেন এবং মস্তকমুণ্ডন করে মাথায় শিখা রেখে পুরুষের বেশ ধারণ করতেন। ১০০ বৎসর বয়সে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আনন্দময়ী ও বৈজয়ন্তী দেবী দুজনেই ছিলেন পূর্ববঙ্গের মেয়ে। আনন্দময়ী জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাঁর পিতার নাম লালা রামগতি সেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামে তাঁর জন্ম। ছেলেবেলা থেকেই আনন্দময়ীর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তীব্র অনুরাগ ও মেধা ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মহারাজা রাজবল্লভ যখন রামগতি সেনের নিকট অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি

চেয়ে পাঠান, তখন পিতা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায়, আনন্দময়ী নিজেই সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও প্রতিকৃতি নিজেই তৈরী করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। গান রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্তা ছিলেন। তাঁর রচিত গানসমূহ বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তা ছাড়া, তিনি নিজ খুল্লতাত জয়নারায়ণকে 'হরিলীলা' (১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে রচিত) কাব্য রচনায় সাহায্য করেছিলেন। তিনি বিবাহিতা ছিলেন। পয়গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত অযোধ্যানারায়ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। পিতৃগৃহে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে তিনি অনুমৃতা হন। তাঁর মা-ও কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে সহমৃতা হয়েছিলেন। সুতরাং এ থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজে অনুমৃতা ও সহমৃতা হওয়া ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

বৈজয়ন্তীদেবী ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন। ফরিদপুরের খান্দুকা গ্রামে তাঁর জন্ম। স্বামী ছিলেন কোটালিপাড়া নিবাসী প্রখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্যের জন্য বৈজয়ন্তী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন না এবং শ্বশুরকুল অপেক্ষা হীন ছিলেন বলে বহুদিন যাবৎ স্বামীগৃহে যেতে পারেন নি। পরে সংস্কৃত শ্লোকে রচিত পত্রে তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে স্বামী তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে যান। সেখানে তিনি স্বামীর সঙ্গে মিলিতভাবে 'আনন্দলতিকা' নামে এক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। এখানি সংস্কৃত ভাষায় একখানি উচ্চমানের কাব্যগ্রন্থ বলে প্রসিদ্ধ।

তিন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিক্ষার সার্বজনীন মাধ্যম ছিল পাঠশালা। প্রতি গ্রামেই পাঠশালা ছিল। পাঠশালাসমূহ পরিচালন করতেন গুরুমশাইরা। গুরুমশাইদের ছাত্ররা 'মশাই' বলে সম্বোধন করত। গুরুমশাই খুব বদান্যতার সঙ্গে বেতের ব্যবহার করতেন। পাঠশালাসমূহে ভর্তি হতে বা পড়তে কোন পয়সাই লাগত না। মাত্র মাঝে মাঝে গুরুমশাইকে একটা 'সিধে' দিতে হত। পাঠশালাসমূহে শিক্ষা দেওয়া হত অক্ষর পরিচয়, ফলা বানান, যুক্তাক্ষর ও লিখনপ্রণালী। দলিল [illegible] এছাড়া, অঙ্ক বিভাগে থাকত শঠকে, কড়াকে,

গণ্ডাকে, বুড়িকে, সেরকে, মনকে, নামতা, সইয়ে, আড়াইয়ে, তেরিজ, জমা খরচ, গুণ, ভাগ, বাজার দরকষা, সুদকষা, কাঠাকালি, বিঘাকালি, পুষ্করিণীকালি, ইটের পাঁজাকালি ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যবহারিক বিষয়। এক কথায়, পাঠশালায় শিক্ষা করলে, একজন রীতিমত শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য বলে সেকালে গণ্য হত। নিজ পরিবার মধ্যেও বিশেষ মর্যাদা লাভ করত।

পাঠশালায় যে মাত্র ছেলেরাই লেখাপড়া শিখত তা নয়, মেয়েরাও। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের বাড়িতেই লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হত। তাদের লেখাপড়ার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করা হত। এভাবেই লেখাপড়া শিখেছিলেন বর্ধমানের মহারাণী কৃষ্ণকুমারী, নাটোরের রাণী ভবানী (১৭১৪-১৭৯৩) প্রমুখরা। বর্ধমান রাজবাড়ির আর যাঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের পট্টমহিষী মহারাণী কমলকুমারী ও মহারাজা প্রতাপচন্দ্র বাহাদুরের দুই রাণী। এঁরা সকলেই সুশিক্ষিতা ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২) বাহাদুরের পরিবারের মেয়েরাও বিদ্যাভ্যাস করতেন। রাজা সুখময় রায় বাহাদুরের (?-১৮১১) পুত্র শিবচন্দ্র রায়ের মেয়ে হরসুন্দরীও সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী এই তিন ভাষায় এমন সুশিক্ষিতা হয়েছিলেন যে পণ্ডিতেরাও তাঁকে ভয় করতেন। তিনি সেকালের একজন নামজাদা পণ্ডিত কুমারহট্ট নিবাসী রূপচাঁদ ন্যায়ালঙ্কারের কাছ থেকে সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি তাবৎগ্রন্থ পাঠ করে সেকালের একজন সুশিক্ষিতা মহিলা হয়েছিলেন। সাধারণ গ্রামের মেয়েরাও পাঁচালী ও কথকতার মাধ্যমে মঙ্গলকাব্যসমূহ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির কাহিনীসমূহের সহিত রীতিমত পরিচিত হতেন। বলা বাহুল্য পাঁচালী গানই ছিল গণশিক্ষার প্রধান মাধ্যম।

চার

যাঁরা চতুষ্পাঠীসমূহ পরিচালনা করতেন, তাঁরা সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পণ্ডিতদের নাম আমরা চারটা সূত্র থেকে পাই। এ চারটা সূত্র হচ্ছে—(১) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭১০-১৭৮২) অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয় যজ্ঞে যে সকল পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, (২) যে এগার জন পণ্ডিত দ্বারা ওয়ারেন হেস্টিংস 'বিবাদার্ণবসেতু', নামক ব্যবস্থাপুস্তক রচনা করিয়েছিলেন, (৩) মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব এক সপ্তাহব্যাপী যে 'বিচার'-এর আয়োজন

করেছিলেন, তাতে যে সকল পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, ও (৪) ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় যে সকল পণ্ডিত ওই কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১১৬০ বঙ্গাব্দের (১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ) মাঘ মাসে নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয় যজ্ঞ করেন। ওই যজ্ঞে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাগত হন। বাঙলার যে সকল পণ্ডিত আহূত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রামগোপাল সার্বভৌম, রাধামোহন গোস্বামী (১৭৩০-৩২), জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৭), রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রমানন্দ বাচস্পতি, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, শিবরাম বাচস্পতি, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি প্রমুখ। এঁদের মধ্যে বাণেশ্বর ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮১) সভাপণ্ডিত। গুপ্তিপাড়ায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন রামদেব তর্কবাগীশ। কৃষ্ণচন্দ্র কোন কারণে বাণেশ্বরের ওপর রুষ্ট হলে, তিনি বর্ধমান রাজ চিত্রসেনের আশ্রয়ে যান। সেখানে তিনি চিত্রসেনের আদেশে বর্গীর হাঙ্গামা সম্বন্ধে গদ্যে-পদ্যে 'চিত্রচম্পূ' সংজ্ঞ্যক এক গ্রন্থ রচনা করেন। (আগে দেখুন)। চিত্রসেনের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যান। পরে কলকাতায় মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের (১৭৩৩-১৭৯৭) আশ্রয়ে যান। ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭০২-১৮১৮) যে এগার জন পণ্ডিতের সাহায্যে 'বিবাদার্ণব সেতু' নামে হিন্দু আইনের এক গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন, বাণেশ্বর তাঁদের অন্যতম ছিলেন। বর্ধমান রাজসভায় থাকাকালীন তিনি 'চন্দ্রাভিষেক' নামে একখানি নাটকও রচনা করেছিলেন।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে ১১১ বৎসর জীবিত থেকে, তিনি মারা যান ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে। চব্বিশ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। অসাধারণ নৈয়ায়িক হিসাবে জগন্নাথের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৮৭ বৎসর তিনি তাঁর এই খ্যাতি অম্লান রাখেন। জগন্নাথ মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের রাজসভাও অলঙ্কৃত করতেন। মহারাজ তাঁকে একখানা তালুক ও পাকা বসতবাড়ী দিয়েছিলেন। মহারাজ একবার তাঁকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা আয়ের একটা জমিদারী দিতে চেয়েছিলেন. কিন্তু জগন্নাথ তা প্রত্যাখান করে

বলেন যে তা হলে তাঁর বংশধরেরা বিলাসী হয়ে পড়বে ও ধনগর্বে বিদ্যাচর্চা বন্ধ করে দেবে। ইংরেজরাও জগন্নাথকে জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাও তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন তাঁর পৌত্র গঙ্গাধরের আনুকূল্যে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস্-এর আদেশে জগন্নাথ 'বিবাদ ভঙ্গার্ণব' নামে একখানা ব্যবস্থাপুস্তক রচনা করেছিলেন (১৭৮৮-৯২)। কোলব্রুক সাহেব সেখানা তর্জমা করে নাম দেন **'A Digest of Hindu Law on Contracts and Succession'.** এ বইখানার ইতিহাস এখানে বলা দরকার। হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ থেকে কার্যোপযোগী একখানা ব্যবস্থা-পুস্তক সংকলন করবার প্রথম আয়োজন করেন ওয়ারেন হেস্টিংস। এ কাজের ভার তিনি এগার জন পণ্ডিতের ওপর দেন। (যথাক্রমে তাঁরা হচ্ছেন রাম-গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যা-লঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণ-কেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত) এঁরা যে ব্যবস্থাপুস্তক রচনা করেছিলেন, তা প্রথম ফারসীতে এবং তা থেকে ন্যাথানিয়াল ব্রাসী হ্যালহেড ইংরেজিতে অনুবাদ করেন (১৭৭৫-৭৬)। কিন্তু দুবার ভাষান্তরিত হবার ফলে গ্রন্থখানি (**'Gentoo Code'**) মূল সংস্কৃত থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। সেজন্য একখানি বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক ব্যবস্থাপুস্তক রচনা করবার জন্য সচেষ্ট হন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস্। প্রথমে তিনি এর ভার দেন মিথিলার স্মার্ত পণ্ডিত সর্বরী ত্রিবেদীর ওপর। সর্বরী ত্রিবেদী যে বইখানা তৈরী করেছিলেন তার নাম ছিল 'বিবাদ সারার্ণব'। কিন্তু সেখানা মনঃপূত না হওয়ায় জোনস্ এর ভার দেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ওপর। জগন্নাথের বইখানা ছিল ৮০০ পৃষ্ঠার বই এবং এখানার নাম ছিল 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব'। জোনস্-এর হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় কোলব্রুক সাহেব সেখানা ইংরেজিতে তর্জমা করান।

ওপরে শঙ্কর তর্কবাগীশের (১৭২৩-১৮১৬) নাম করেছি। তিনি ছিলেন কর্কশ তর্কশাস্ত্রে প্রতিভার মুখ্য অবতার। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত হয়েছিল—**'Shankar Pandit is the head of the college of Nadia, and allowed to be the first philosopher and scholar in the whole university; his name inspired the youth with the**

love of learning, and the greatest rajahs regarded him with great veneration.' নানাশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল, এবং 'বাঙালী প্রতিভার মূর্ত প্রতীকরূপে ভারতের সর্বত্র তিনি অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন।' যাঁরা মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব অনুষ্ঠিত 'বিচার'-এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও শঙ্কর তর্কবাগীশ ছিলেন। শঙ্কর তর্কবাগীশ ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছাড়া, আরও যে সব পণ্ডিত ওই 'বিচার'-এ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বলরাম তর্কভূষণ, মানিকচন্দ্র তর্কভূষণ ও বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

বাঙলার পণ্ডিত সমাজের মধ্যে আর যাঁরা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশী, তারিণীচরণ মিত্র, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু প্রমুখ।

অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও অনেক পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তির নাম পাই। পণ্ডিতজনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম, গোকুলানন্দ বিদ্যামণি, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, জগন্নাথ পঞ্চানন, কালিকিঙ্কর তর্কবাগীশ, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন, দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার, দুলালচাঁদ তর্কবাগীশ, বলদেব বিদ্যাভূষণ, বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, মথুরেশ (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ), মানিকচন্দ্র তর্কভূষণ, রূপমঞ্জরী, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম, হটী বিদ্যালঙ্কার ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী। এ সকল পণ্ডিতদের শাস্ত্রানুশীলন ও সাহিত্যচর্চার কথা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বলব। সেখানে আরও বলব অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যসাধক ও অন্যান্য গুণিজনের কথা। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে যাঁদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, তাঁরা হচ্ছেন গঙ্গারাম দাস (দেব চৌধুরী), গোপাল ভাঁড়, গোলকনাথ দাস, জগদ্রাম রায়, আনন্দরাম চক্রবর্তী, ঈশা আল্লাহ খান, কবিচন্দ্র, জয়নারায়ণ রায়, জীবন ঘোষাল, দামোদর মিশ্র, দ্বিজরাম, নিত্যানন্দ মিশ্র, নিধিরাম কবিচন্দ্র, পুরুষোত্তম মিশ্র, বনদুর্লভ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রমানাথ রায়, রামসিংহ ও রামগতি সেন।

চার

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে অনেকে ইংরেজি ভাষাও শিখতে আরম্ভ করেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে কাজকর্মের সুবিধার জন্য এদেশের একশ্রেণীর লোকের মধ্যে ইংরেজি শেখার প্রবল আকাঙ্খা জেগেছিল। বস্তুতঃ ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের পর থেকেই বাঙালী ইংরেজি শিখতে শুরু করেছিল। এ সময় আমরা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীদের মধ্যে রামনারায়ণ মিশ্র ও আনন্দরামের নাম শুনি। সুপ্রিম কোর্টের কেরানীদের তো ইংরেজি শিখতেই হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শেরিফের আফিসের হেড ক্লার্ক রামমোহন মজুমদারের নাম হিকির 'স্মৃতিকথা'য় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। এ ছাড়া, এটর্নীদের ক্লার্কদেরও ইংরেজি জানতে হত। এ রকম কেরানীদের মধ্যে আমরা হিকির 'হেড' কেরানী রামধন ঘোষের নাম শুনি। সে যুগে যাঁরা সাহেবদের দেওয়ানী বা বেনিয়ানি করত, তাঁদেরও ইংরেজি জানতে হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গোলন্দাজ বাহিনীর ক্যাপটেন নাথানিয়াল কিণ্ডারসলের স্ত্রী শ্রীমতী কিণ্ডারসলে ১৭৬৫ থেকে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতায় বাস করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখে গেছেন যে এদেশের বেনিয়ানরা মোটামুটি ভাল ইংরেজি বলে। ("usually speak pretty tolerable English")। হেস্টিংস-এর বেনিয়ান কান্তবাবুও ইংরেজি জানতেন।

এরা সকলে প্রথম প্রথম কিভাবে ইংরেজি শিখতেন, তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনখানা শব্দকোষ প্রকাশিত হওয়ায় ইংরেজি শেখার খানিকটা সুবিধা হয়েছিল। এই তিনখানা শব্দকোষ হচ্ছে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত অ্যারন আপজন কৃত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি', ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জন মিলারের 'শিক্ষাগুরু' ও ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হেনরী পিটস্ ফরস্টারের 'ভোকাবুলারী'। এই তিনখানা বইয়ের মধ্যে ফরস্টারের বইটাই বাঙালী সমাজের বিশেষ কাজে লেগেছিল। এ থেকে শব্দচয়ন করে বাঙালী কাজ চালাবার মত ইংরেজি শিখেছিল। সে যুগের বাঙালীরা অবশ্য গ্রামার বা ইডিয়মের ধার ধারত না। তবে সাহেবরা সে রকম ইংরেজি বুঝত।

শিক্ষাক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে জেনারেল ক্লড মার্টিন (১৭৩৫-১৮০০) নামে কোম্পানির এক কর্মচারী কর্তৃক বিনামূল্যে

'বিদ্যার্থীদের পাঠার্থে' এক বিদ্যায়তন স্থাপনের জন্য তেত্রিশ লক্ষ টাকা উইল করে রেখে যাওয়া। সেই টাকার কিছু অংশে পরবর্তী শতাব্দীতে স্থাপিত হয়েছিল কলকাতায় 'লা মার্টিনিয়ার' বিদ্যায়তন (১৮৩৩-৩৫)।

পাঁচ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষাপ্রসারে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর (১৭৩২-১৮৮১) নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। হেস্টিংস ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি। প্রাচ্যবিদ্যাসমূহের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি হিন্দু আইনের যে বই এদেশের এগার জন পণ্ডিতদের দিয়ে প্রণয়ন করিয়েছিলেন তার কথা আমরা আগেই বলেছি। এ ছাড়া, তিনি হ্যালহেডকে দিয়ে ইংরেজিতে বাংলাভাষার একখানা ব্যাকরণ লিখিয়েছিলেন এবং তা ছাপবার জন্য চালস উইলকিনস্‌কে দিয়ে বাংলা হরফ তৈরী করিয়েছিলেন। উইলকিনস্‌কে দিয়ে তিনি 'শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা'র ইংরেজি অনুবাদও করিয়েছিলেন, এবং তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি একটা মাদ্রাসাও স্থাপন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার শিক্ষিত পদস্থ মুসলমানরা ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে দেখা করে জানান যে, তাঁরা মজিউদ্দিন নামে একজন পণ্ডিতের সন্ধান পেয়েছেন, এবং এই সুযোগে একটা মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে মুসলমান ছাত্ররা মজিউদ্দিনের অধীনে মুসলমান আইন শিখে সরকারী কাজে সহায়তা করতে পারবে। হেস্টিংস এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পরবর্তী অকটোবর মাসে মজিউদ্দিনের ওপর একটা মাদ্রাসা স্থাপনের ভার দেন। আগে বৌবাজারের দক্ষিণপূর্বে যে বাড়ীতে চার্চ অভ স্কটল্যাণ্ডের জেনানা মিশন ছিল, সেই জমির ওপরই মাদ্রাসাটা প্রথম নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু সনাতনী হিন্দুদের তরফ থেকে এরূপ কোন প্রস্তাব না আসায়, কোন সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়নি। বস্তুতঃ শিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানরা যেরূপ উদ্যোগী ছিল, সনাতনী হিন্দুরা সেরূপ ছিল না। এ সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট দানশীল মুসলমানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হচ্ছেন হাজী মহম্মদ মহসীন (১৭৩২-১৮১২)। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে এক লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা আয়ের এক সম্পত্তি দান করেছিলেন। হুগলীর ইমামবাড়া, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, মহসীন বৃত্তি প্রভৃতি তাঁরই অর্থ-

সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। এ ছাড়া, তাঁর অর্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীতে আরবী শিক্ষার জন্য বিদ্যায়তন স্থাপিত হয়েছিল।

গোড়ার দিকে ইংরেজদেরও এদেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াসের অভাব ছিল। এ সম্বন্ধে ডবলিউ. ডবলিউ. হাণ্টার বলেছেন—"During the early days of the East India Company's rule the promotion of education was not recognised as a duty of government"। বস্তুতঃ শতাব্দী উত্তীর্ণ হবার পর ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সময়েই শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রথম এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরবর্তী কালে ইংরেজি ভাষার শব্দ বাংলা ভাষাকে (বিশেষ করে কথ্যভাষাকে) বেশ সমৃদ্ধশালী করে তুলেছিল।

মঠ, মন্দির ও মসজিদ

বাঙলার অনেক বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিই চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩০) প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যের তিরোভাবের পর তাঁরা অনেকেই বাঙলার নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণ ও গৌর-নিতাই-এর মন্দির স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া, বৈষ্ণবরা অনেক মঠও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। তা ছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু শিবমন্দির ও শাক্তমন্দিরও নির্মিত হয়েছিল। অধিকাংশ স্থানেই এই সকল মন্দির নির্মাণে বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতি অনুসৃত হয়েছিল। বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্য রীতি কি তা এখানে বলা প্রাসঙ্গিক হবে।

বাঙলার মন্দিরসমূহকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) চালা, (২) রত্ন, ও (৩) দালান-রীতিতে নির্মিত মন্দির। এগুলি ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে স্বীকৃত 'রেখ', 'বেশর' ও 'দ্রাবিড়' শৈলীরীতিতে নির্মিত মন্দিরসমূহ থেকে ভিন্ন। তার মানে বাঙলার মন্দিরসমূহ বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। গ্রাম-বাঙলার সর্বত্র খড়ের যে চারচালার কুটির দেখতে পাওয়া যায়, তার অনুকরণে নির্মিত হত চারচালা মন্দির। একটি চারচালা মন্দিরের মাথার ওপর আর-একটি ছোট চারচালা মন্দির নির্মাণ করে আটচালা মন্দির গঠন করা হত। আটচালা মন্দিরের নিদর্শন বাঙলার সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। বাঙলার শিবমন্দিরগুলি সাধারণতঃ এই শৈলরীতিতে গঠিত মন্দির। কালী-ঘাটের কালীমন্দিরও এই রীতিতে গঠিত মন্দির। আর যখন মাঝখানে একটি বড় শিখর বা চূড়া তৈরী করে, তার চার কোণে চারটি ছোট শিখর বা চূড়া তৈরী করা হত, তাকে 'পঞ্চরত্ন' মন্দির বলা হত। আবার যখন পঞ্চরত্ন মন্দিরের মাঝের চূড়াটির স্থানে একটি দ্বিতল কুঠরি তৈরী করে, তার ছাদের চার-কোণে চারটি ছোট চূড়া ও মাঝখানে একটি বড় চূড়া তৈরী করা হত, তখন তাকে 'নবরত্ন' মন্দির বলা হত। এভাবে এক এক তল বাড়িয়ে মন্দিরকে ত্রয়োদশরত্ন, সপ্তদশরত্ন করা হত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির নবরত্ন মন্দির। যেখানে শিখরের বদলে মন্দিরের ছাদ সমতল হত, তাকে 'দালান' রীতিতে

গঠিত মন্দির বলা হত। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির দালানরীতিতে গঠিত মন্দিরের নিদর্শন। বলা বাহুল্য, বাঙলার মন্দিরসমূহ ইঁট দিয়ে তৈরী করা হত। পাথর দিয়ে নয়। তবে পাথরের তৈরী মন্দিরও দু-চারটে আছে, তবে সেগুলি 'রেখ' মন্দির।

দুই

বাঙলা দেশের বহু ইটের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'টেরাকোটা' বা পোড়া-মাটির অলঙ্করণ। এগুলি সাধারণত তৈরী করা হত টালির আকারে ছাঁচে ফেলে, বা কাঁচামাটির ওপর উৎকীর্ণ করে 'পোন' বা ভাটিতে পুড়িয়ে। এরূপ অলঙ্করণের দিক দিয়ে হালিশহরের নন্দকিশোরজীউর মন্দির ও বীরভূমের মন্দিরসমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মন্দিরগুলির অলঙ্করণের বিষয়বস্তু হচ্ছে—রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী, কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক বৃত্তান্ত, সমকালীন সমাজচিত্র, বন্যপশুর অনায়াস বিচরণ-ভঙ্গী ও সাবলীল গতিবেগ, এবং ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্শা প্রভৃতি। রামায়ণের কাহিনীর মধ্যে চিত্রিত হয়েছে হরধনুভঙ্গ, রামসীতার বনগমন, সূর্পণখার নাসিকাছেদন, মারীচবধ, রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ, জটায়ুবধ, অশোক বনে সীতা প্রভৃতি, এবং মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, শকুনির পাশাখেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধদৃশ্য, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি। পৌরাণিক বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে বিষ্ণুর দশাবতার, দশ দিক্পাল, দশ মহাবিদ্যা ও অন্যান্য মাতৃকাদেবীসমূহ এবং অন্যান্য জনপ্রিয় উপাখ্যান যথা—শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দিনী ইত্যাদি। সামাজিক দৃশ্যসমূহের মধ্যে আছে বারাঙ্গনা-বিলাস ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, বেদে-বেদেনীর কসরৎ, সাহেবদের কাছে এদেশী মেয়েদের প্রেম-নিবেদন, মোহান্ত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও নানারূপ ঘরোয়া দৃশ্য। (এই প্রসঙ্গে এই লেখকের 'বাঙলা ও বাঙালী' পৃঃ ৩৮-৫৬ ও 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস' পৃঃ ৭৮-৮০ দ্রষ্টব্য)।

তিন

এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরগুলি সম্বন্ধে কিছু বলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির-নির্মাতা বিশিষ্ট ভূম্যাধিকারীদের মধ্যে ছিলেন নাটোরের রাণী ভবানী, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ভূষণার সীতারাম রায় প্রমুখ। (কলকাতার মন্দির নির্মাতাগণ সম্বন্ধে নীচে দেখুন)। পূর্ববর্তী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রবল প্রতাপশালী ভূম্যাধিকারী ছিলেন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ। তাঁদের রাজত্বকালই ছিল মধ্যযুগের হিন্দু মন্দির নির্মাণের স্বর্ণযুগ। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত তাঁদের অনেক মন্দির এখন পরিত্যক্ত বা ভগ্ন অবস্থায় বিষ্ণুপুরে দেখতে পাওয়া যাবে। এ সকল মন্দিরের কারুকার্য ও স্থাপত্যরীতি এখনও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের রাজাদের আধিপত্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল এবং তার সঙ্গে মন্দির নির্মাণের ধারাও স্তিমিত হয়েছিল, তা হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মল্লরাজগণ কর্তৃক মন্দির নির্মাণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। মল্লরাজগণ কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরের মধ্যে উল্লেখের দাবী রাখে লালবাঁধের ধারে কালাচাঁদের মন্দির ও ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত রাধাশ্যামের মন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের বসুপল্লীতে বসুপরিবারের কোন ব্যক্তি নবরত্ন শ্রীধর মন্দিরটিও নির্মাণ করিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভূষণার রাজা সীতারাম রায় একটি কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন (১৭০৩-০৪)। এই শতাব্দীতেই নির্মিত হয়েছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খাটনগরের লক্ষ্মীনারায়ণের পঞ্চরত্ন মন্দির (১৭৫৪), ও তারই কাছে অবস্থিত শিখরবিশিষ্ট একটি শিবমন্দির ও দিনাজপুরের ১২ মাইল দূরে অবস্থিত কান্তনগরের বিচিত্র কারুকার্যখচিত নবরত্ন মন্দির (১৭০৪-২২)। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল বর্ধমান জেলার কালনা গ্রামে অবস্থিত পঁচিশ-রত্ন লালজীর মন্দির ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির। শতাব্দীর মধ্যভাগে একটা পাথরের তৈরী 'রেখ' দেউল তৈরী হয়েছিল বীরভূম জেলার ভাণ্ডীশ্বরে (১৭৫৪)। শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৭০৪) পুরুলিয়ার ধরাপাট গ্রামের 'রেখ' মন্দিরটিও পাথর দিয়েই তৈরী হয়েছিল। তা না হলে, বাঙলাদেশের মন্দিরগুলো সব ইটেরই তৈরী। মুরশিদাবাদের সন্নিকটে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বড়নগরে রাণী ভবানী বহু মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে বিশাল ভবানীশ্বর মন্দিরই সবচেয়ে বড়। এখানে এক পুষ্করিণীর চারপাশে

চারটি জোড়বাংলা মন্দিরও আছে। শতাব্দীর শেষের দিকে ত্রিপুরাধিপতি কৃষ্ণমাণিক্য (—১৭৭৩)-এর আমলে কুমিল্লায় এক সপ্তদশ-রত্ন মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দির-নির্মাণ পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলি মন্দির তৈরী করা। অধিকাংশ স্থলেই এটা শিবমন্দিরের ক্ষেত্রেই অবলম্বিত হত। এরূপ সারিবদ্ধ মন্দিরের সংখ্যা ১২ থেকে ১০৮ পর্যন্ত হত। যেমন, রাণী ভবানী বড়নগরে ১০০ শত শিবমন্দির তৈরী করেছিলেন।

চার

এবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরী কলকাতার কতগুলি মন্দিরের কথা বলব। মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকাতার মন্দিরসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে নন্দরাম সেন, বনমালী সরকার ও গোবিন্দরাম মিত্র নির্মিত মন্দিরসমূহ। নন্দরাম সেন প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর শিবের মন্দির নন্দরাম সেন স্ট্রীটে অবস্থিত। নন্দরাম সেন ছিলেন কলকাতার প্রথম কালেকটর র‍্যালফ্ শেলডনের সহকারী। সেজন্য মনে হয় মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বনমালী সরকারের শিবমন্দির ও গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির, এ দুটোও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিন চার দশকের মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল। দুটো মন্দিরই কুমারটুলিতে অবস্থিত ছিল। মন্দিরের গায়ে খোদিত তারিখ অনুযায়ী ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়েছিল, তবে তারিখটা সন্দেহজনক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সব মন্দির স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল মদনমোহন দত্তের শিবমন্দিরসমূহ। মদনমোহন ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও হাটখোলার দত্ত পরিবারের প্রতিভূ। তাঁর স্থাপিত আটচালারীতিতে গঠিত দুটি শিবমন্দিরই হাটখোলায় অবস্থিত। ত্রিলোকরাম পাকরাশী স্থাপিত মন্দিরগুলি বৌবাজারে কিণ্ডারডাইন লেনে অবস্থিত। একটি নবরত্ন ও দুটি পঞ্চরত্ন। ত্রিলোকরাম ছিলেন কলকাতা দুর্গের দেওয়ান। কলকাতায় নূতন দুর্গ নির্মাণের সময় যে সব মালমশলা ব্যবহৃত হয়েছিল, এই মন্দিরগুলি সেই সেই মালমশলায় নির্মিত। সেজন্য মনে হয় এগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তৈরী হয়েছিল। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল ভূ-কৈলাস রাজবাড়ীর শিবগঙ্গা জলাধারের উত্তর দিকের ঘাটের দুইপাশে আটচালা-

রীতিতে নির্মিত দুটো বড় শিব মন্দির। সমসাময়িককালে কতকগুলি আটচালা শিবমন্দির তৈরী করিয়েছিলেন বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুজ্যে মশায়। এগুলো প্রায় সবই গিরিশ অ্যাভেন্যুর গর্ভে গিয়েছে।

পাঁচ

মাত্র হিন্দুরাই যে মন্দির তৈরী করে যাচ্ছিলেন, তা নয়। মুসলমানরাও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু মসজিদ ও দরগা নির্মাণ করেছিলেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে মুরশিদাবাদের নিকট মুরশিদকুলি খান কর্তৃক নির্মিত কাটরা মসজিদ। এই মসজিদটি তৈরী হয়েছিল ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে। এটি একটি প্রশস্ত সম-চতুষ্কোণ অঙ্গনের মধ্যে নির্মিত। মসজিদটি ১৩০ ফুট লম্বা ও ২৪ ফুট চওড়া। অনেক হিন্দু মন্দির ভেঙে তারই মালমশলা দিয়ে মসজিদটি তৈরী করা হয়েছিল। মসজিদটির চারকোণে ৬০ ফুট উচ্চ চারটি অষ্টকোণ মিনার ছিল। ৬৭টি ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে মিনারের চূড়ায় ওঠা যেত। মসজিদটির আঙ্গিনায় ওঠবার জন্য ১৪টি সোপান ছিল। এই সোপানের তলাতেই মুরশিদকুলি খানের সমাধিকক্ষ অবস্থিত। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফরের স্ত্রী মুনিবেগমও মুরশিদাবাদের প্রসিদ্ধ চক মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

শাস্ত্রানুশীলন, সাহিত্যসাধনা ও সঙ্গীতচর্চা

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সব পণ্ডিতের নাম আগের এক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, তাঁদের সকলেরই টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। এই সকল চতুষ্পাঠীর মাধ্যমেই তাঁরা শাস্ত্রানুশীলন করতেন ও ছাত্রদের নানা শাস্ত্র এবং শব্দ, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ছন্দ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নৈয়ায়িক ও স্মার্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। অনেকে বিচিত্র বিধানও দিতেন। যেমন কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম (১৭৭৫-১৮৪০) শারদীয়া পূজার নবমীর দিনই দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের বিধান দিয়েছিলেন। তা থেকেই 'কৃষ্ণানন্দী দশহরা' প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়েছে। বরিশাল কলসকাঠির বিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদারবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল পণ্ডিত বাকলা সমাজকে উজ্জ্বল করেছিলেন, কৃষ্ণানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন দিক্‌পাল। নবদ্বীপে শঙ্কর তর্কবাগীশের কাছে শিক্ষালাভ করে নিজ প্রতিভাগুণে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে ছাত্ররা তাঁর চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করতে আসত।

ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের (১৬৯৪-১৮০৭) কথা আমরা আগেই বলেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরকম দীর্ঘজীবী ও অসাধারণ পণ্ডিত আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে গঙ্গাজলী করবার জন্য যখন তাঁকে নিয়ে আসা হয়, তখন তাঁর ছাত্রমণ্ডলী তাঁকে প্রশ্ন করেছিল 'আপনি তো দীর্ঘকাল ধরে শাস্ত্রানুশীলন ও ঈশ্বর সাধনা করলেন, এখন আমাদের বলে যান, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?' জগন্নাথ উত্তর দিয়েছিল 'ঈশ্বর নীরাকার'।

অন্যান্য সূত্র থেকেও আমরা অনেক পণ্ডিতের নাম পাই। নবদ্বীপের গোকুলানন্দ বিদ্যামণি অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দেশীয় প্রথায় একটি উৎকৃষ্ট ঘড়ি তৈরী করেছিলেন, যার সাহায্যে দণ্ড, পল, ইত্যাদির সূক্ষ্মসময় সঠিকভাবে নির্ণয় করা যেত। নবদ্বীপের গোপাল (রামগোপাল) ন্যায়ালঙ্কার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজা রাজবল্লভ (১৬৯৮–১৭৬৩) যখন তাঁর অষ্টমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিয়ে দেবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্রের মতামত জানবার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত পাঠান, তখন তারা গোপালকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গোপাল অপকৌশল প্রয়োগ

করে বিধবা বিবাহ দেশাচার বিরুদ্ধ বলে প্রচার করে, এবং রাজবল্লভের চেষ্টা ব্যর্থ করে। তিনি 'আচারনির্ণয়', 'উদ্বাহনির্ণয়', 'কালনির্ণয়', 'শুদ্ধিনির্ণয়', 'দায়নির্ণয়', 'বিচারনির্ণয়', 'তিথিনির্ণয়', 'সংক্রান্তিনির্ণয়', প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

ফরিদপুরের চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন একজন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। নিজ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা তিনি নদীয়ার শঙ্কর তর্কবাগীশ, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতদের সন্তুষ্ট করেছিলেন। নব্যন্যায়ে তাঁর রচিত 'চান্দ্রনারায়ণী' পত্রিকা পণ্ডিতসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। এ ছাড়া তিনি 'কুসুমাঞ্জলি'র টীকা ও ন্যায়সূত্রের বৃত্তি রচনা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের বাকলার একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন জগন্নাথ পঞ্চানন। তাঁর পাণ্ডিত্যের সুবাদে তাঁর গ্রাম নলচিড়া 'নিম নবদ্বীপ' বা অর্ধ-নবদ্বীপ আখ্যা পেয়েছিল।

২৪ পরগণার খাটুরার অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল স্মৃতি শাস্ত্রে। শোভাবাজার রাজবাটিতে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং কলকাতার হাতিবাগানে তিনি একটি টোল খুলেছিলেন। তাঁরই জ্ঞাতি ও ছাত্র ছিলেন কালীকিঙ্কর তর্কবাগীশ। একবার শোভাবাজার রাজবাটিতে কোনও এক বিচারে জয়লাভ করে তিনি নিজ অধ্যাপক অনন্তরামের সম্মান বৃদ্ধি করেছিলেন।

কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ছিলেন নদীয়ার মালীপোতার একজন বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ-পণ্ডিত। আসামের আহমবংশীয় নৃপতি রুদ্রসিংহ হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়া-কলাপাদির (১৬৯৬-১৭১৪) জন্য তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কামাখ্যা মন্দির রক্ষার ভার তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছিল। সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল নদীয়ার বজ্রাপুরের জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের (১৭৭৫-১৮৪৬)। তিনি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ কোলব্রুকের এবং পরে শ্রীরামপুর মিশনের ক্যারীর পণ্ডিত ছিলেন। সুকবি হিসাবেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ফারসী ভাষাতেও তাঁর দখল ছিল, এবং তিনি একখানা ফারসী অভিধানও সংকলন করেছিলেন। নৈয়ায়িক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন নদীয়ার রামভদ্র সার্বভৌমের ছাত্র জয়রাম ন্যায়-পঞ্চানন। নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রচিত নয়খানা গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'ন্যায়সিদ্ধান্তমালা', 'তত্ত্বচিন্তামণি', 'গুণদীধিতিবিবৃতি',

'কাব্যপ্রকাশতিলক' ইত্যাদি। কাশীতে অধ্যাপনাকালে তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্ম 'জগদ্‌গুরু' আখ্যা লাভ করেছিলেন। নৈয়ায়িক হিসাবে নাম করেছিলেন ত্রিপুরার কালীকচ্ছের দয়ারাম ন্যায়ালঙ্কার। বহু দূরদেশ থেকে ছাত্ররা তাঁর চতুষ্পাঠীতে পড়তে আসত।

নব্যন্যায়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন বর্ধমানের সাতগাছিয়ার দুলাল তর্কবাগীশ। তিনি শঙ্কর তর্কবাগীশের প্রতিপক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত নব্যন্যায়ের বহুতর পত্রিকা নবদ্বীপাদি সমাজে ও বাঙলার বাহিরে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, জয়রাম তর্কপঞ্চানন, কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর, দুর্গাদাস তর্কপঞ্চানন প্রমুখ। নৈয়ায়িক ও পত্রিকাকার হিসাবে আরও একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন নবদ্বীপের বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন। সমকালীন প্রখ্যাত নৈয়ায়িকগণ তাঁর পত্রিকাসমূহকে প্রামাণিক বলে গণ্য করতেন। বৈদ্যবংশীয় মহারাজা রাজবল্লভ দ্বিজাচারে উপনয়ন-অনুষ্ঠানের জন্য যে সব পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র নিয়েছিলেন, বিশ্বনাথ তাঁদের অন্যতম। এই ব্যবস্থাপত্রের রচনাকাল ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দ। বিশ্বনাথের ছেলে কালীপ্রসাদ তর্কালঙ্কারও (১৭৩৯—?) একজন প্রখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবিদের অন্যতম ছিলেন মথুরেশ। তিনি একবার এক হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোক আবৃত্তি করে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে হারিয়ে মহারাজার কাছ থেকে 'মহাকবি' উপাধি পেয়েছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান সভাপণ্ডিতদের মধ্যে আরও ছিলেন শিবরাম বাচস্পতি। 'ষড়্‌দর্শনবিৎ' আখ্যায় তিনি ভূষিত হয়েছিলেন। অনুমানখণ্ডের চর্চা যখন চরমে উঠেছিল, সে সময় তিনি অনাদৃত প্রাচীন ন্যায়ের চর্চা পুনর্জীবিত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'গৌতমসূত্রবিধি' ও গদাধর-রচিত মুক্তিবাদের ওপর এক টীকা। রাজা রাজবল্লভের সভায় তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের আদি বাড়ি ছিল মালদহে। কিন্তু নবদ্বীপে অধ্যয়ন করতে এসে তিনি নবদ্বীপেই বসবাস করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর প্রণীত জীমূতবাহনের দায়ভাগ টীকা ও 'দায়ক্রমসংগ্রহ' প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য হয় ও এখনও নবদ্বীপে পড়ানো হয়। কোলব্রুক সাহেব তাঁর 'দায়ক্রমসংগ্রহ'-এর ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।

স্মার্তপণ্ডিত হিসাবে নদীয়ার রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম। ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে নবদ্বীপাধিপতি রামকৃষ্ণ রায় তাঁকে ভূমিদান করেন, ও রাজা রামজীবনের তিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণপদামৃত' (১৭২২), 'পদাঙ্কদূত' (১৭২৩), 'মুকুন্দপদমাধুরী', ও ও 'সিদ্ধান্তচিন্তামণি'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তন্ত্রশাস্ত্রে বিশেষ বু্যৎপত্তি ছিল হুগলী পালপাড়ার হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর (১৭৬২-১৮৩২)। তাঁর 'কুলাবধুত' উপাধি ছিল। রাজা রামমোহনের (১৭৭২-১৮৩৩) সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, এবং অনেকের মতে তিনি রামমোহনের তন্ত্রশিক্ষার গুরু ছিলেন। তাঁর রচিত 'কুলার্ণবতন্ত্র' ও 'মহনির্বাণতন্ত্র'-দ্বয়ের টীকা তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়।

দুই

পণ্ডিতগণ কর্তৃক শাস্ত্র অনুশীলন ও সংস্কৃত ভাষায় প্রামাণিক টীকা-টিপ্পনী রচনা ছাড়া, অষ্টাদশ শতাব্দী উদ্ভাসিত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যচর্চার আলোকে। সুধীজন নূতন নূতন কাব্য রচনা করেছিলেন, এবং এ বিষয়ে অনেকেই সমসাময়িক রাজারাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। যাঁরা এরূপ পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রামেশ্বর (চক্রবর্তী) ভট্টাচার্য, ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, কবিচন্দ্র, জগদ্রাম ও নিত্যানন্দ। রামেশ্বরই ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সবচেয়ে বড় কবি। তাঁর কথা আমরা আগেই বলেছি।

'শিবায়ন' ছাড়াও রামেশ্বর রচনা করেছিলেন একখানা 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' ও মহাভারতের শান্তিপর্ব অবলম্বনে এক কাব্য।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন শঙ্কর কবিচন্দ্র। তিনি গোপাল সিংহের (১৭১২-৪৮) সভাকবি ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে ছিল 'গোবিন্দমঙ্গল', 'কৃষ্ণমঙ্গল', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' প্রভৃতি।

সমসাময়িককালে তাঁর কবিখ্যাতির জন্য বর্ধমান-রাজ কীর্তিচন্দ্র কর্তৃক সভাকবির পদে বৃত হয়েছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। রাজার আদেশে তিনি এক-খানা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে তা সম্পূর্ণ করেন।

তিনিও একখানা 'সত্যনারায়ণের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন।

ঘনরামের কাব্যভাষার উত্তরসূরী হচ্ছেন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০)। নানারূপ অদৃষ্টবৈগুণ্যের পর তিনি নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পান, এবং তাঁর সভাকবি নিযুক্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করে 'রায় গুণাকর' উপাধি পান। তিনি আরও রচনা করেন 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসমঞ্জরী', 'সত্যপীরের কথা', 'নাগাষ্টক' প্রভৃতি গ্রন্থ। ভাষার লালিত্য, ও সুষমা ছন্দের নৈপুণ্য ও চরিত্র অঙ্কনের দক্ষতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।

পঞ্চকুটাধিপতি রঘুনাথ সিংহের আদেশে একখানা 'অদ্ভুত রামায়ণ' রচনা করেছিলেন বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামের জগদ্রাম রায়। মূল অদ্ভুত রামায়ণ-এর সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এতে রামায়ণের সপ্তকাণ্ড ছাড়া পুষ্করাকাণ্ড নামে একটা অতিরিক্ত কাণ্ড আছে। 'অদ্ভুত রামায়ণ' ছাড়া তিনি আরও রচনা করেছিলেন 'দুর্গাপঞ্চরাত্র', 'আত্মবোধ' ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ (মিশ্র) চক্রবর্তী মেদিনীপুরের কাশীজোড়াধিপতি রাজনারায়ণের সভাসদ ছিলেন। তিনি রচনা করেছিলেন 'শীতলামঙ্গল', 'ইন্দ্রপূজা', 'পাণ্ডব-পূজা', 'বিরাট পূজা', 'সীতাপূজা', 'লক্ষ্মীমঙ্গল', 'কালুরায়ের গীত' প্রভৃতি। তাঁর লেখার মধ্যে বহু ফারসী, হিন্দী ও উর্দু শব্দ আছে। তাঁর লেখাগুলি পাঁচালী আকারে মেদিনীপুরে গীত হত।

বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের পূর্ববর্তী ধারা অনুযায়ী অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ কাব্যের প্রাচুর্যই বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করি। শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে গঙ্গাধর দাস রচনা করেছিলেন তাঁর 'জগৎমঙ্গলা' কাব্য। শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়েছিল তিনখানা ধর্মমঙ্গল কাব্য—মানিক গাঙ্গুলির, রামকান্তের ও গোবিন্দরামের। এ ছাড়া আঠারো শতকেই রচনা করেছিলেন জীবন ঘোষাল তাঁর 'মনসামঙ্গল,' নিধিরাম কবিচন্দ্র তাঁর 'গোবিন্দমঙ্গল', নিধিরাম কবিরত্ন তাঁর 'কালিকামঙ্গল' ও আনন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'পদ্মাপুরাণ'। অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'রামায়ণ' দ্বারা। এছাড়া আঠারো শতকে রচিত হয়েছিল গঙ্গারাম দাস (দেব চৌধুরীর) 'লবকুশ সংবাদ', 'শুক সংবাদ ও 'মহারাষ্ট্র পুরাণ', জয়নারায়ণ রায়ের 'চণ্ডীকাব্য' ও 'হরিলীলা', নিধিরাম কবিচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও

'দাতাকর্ণ', বনদুর্লভের 'দুর্গাবিজয়', শচীনন্দনের 'উজ্জ্বলনীলমণি', রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি', জগৎনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মবোধ' ও জয়নারায়ণ ঘোষাল কর্তৃক পদ্মপুরাণের 'কাশীখণ্ড'। অনুবাদ সাহিত্যে আরও উল্লেখনীয় সংযোজন হচ্ছে রামগতি সেনের 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', ও 'যোগকল্পলতা' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ও গোলকনাথ দাস কর্তৃক ইংরেজি 'Disguise' নাটকের অনুবাদ। দামোদর মিশ্র রচনা করেছিলেন একখানা সঙ্গীতের বই, নাম 'সঙ্গীত দর্পণ', ও রামসিংহ তাঁর 'রাজমালা'।

তিন

পদাবলী সাহিত্যেও আঠারো শতক বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। শতাব্দীর প্রখ্যাত পদকর্তা ছিলেন গিরিধর। তিনি জয়দেব-রচিত 'গীতগোবিন্দ' সর্বপ্রথম বাংলা পদ্যে অনুবাদ করেন (১৭৩৬)। 'পদকল্পতরু' নামক বিখ্যাত পদাবলী গ্রন্থ এই শতাব্দীতেই সংকলন করেন স্বনামধন্য কীর্তনীয়া বৈষ্ণবদাস (আসল নাম গোকুলানন্দ সেন)। বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুরে তাঁর বাড়ী ছিল। তিনি আরও সংকলন করেছিলেন 'গুরুকুলপঞ্জিকা'। তাঁর রচিত গীতসমূহ এখনও 'টেঞার ঢপ' নামে প্রসিদ্ধ। আঠারো শতকের একজন বড় পদকর্তা ছিলেন উদ্ধব দাস। তাঁর রচিত শতাধিক পদ পাওয়া যায়। আঠারো শতকের পদকর্তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহিমাসূচক শ্রুতিমধুর অনুপ্রাসযুক্ত পদ-রচনায় বিশেষ দক্ষতা ছিল বীরভূমের জোফলাই নিবাসী জগদানন্দের। শতাব্দীর আর দু'জন দক্ষ পদরচয়িতা ছিলেন চন্দ্রশেখর (শশিশেখর) ও অকিঞ্চন। অকিঞ্চনের প্রকৃত নাম ছিল ব্রজকিশোর রায়। তিনি বর্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বেশ উচ্চমানের বহু শ্যামাসঙ্গীত ও কৃষ্ণ-বিষয়ক গান রচনা করেছিলেন।

চার

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত পালাগান রচয়িতা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর। তাঁর রচিত মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রাবণপূজা, বরুণপূজা, ইন্দ্রপূজা, লঙ্কাপূজা, পঞ্চাননমঙ্গল, দেবী লক্ষ্মীর গীত, সত্যনারায়ণের সাত ভাই, দুঃখীর পালা, শীতলার জন্মপালা, শীতলার জাগরণপালা প্রভৃতি পালাগানগুলি এক সময় মেদিনীপুর ও

হাওড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে খুব জনপ্রিয় ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যধারার পাশে আর এক সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল। এটা হচ্ছে কবিওয়ালাদের গান। এর স্রষ্টা ছিল রঘুনাথ দাস। শতাব্দীর প্রখ্যাত কবিয়ালদের মধ্যে ছিল রাসুনৃসিংহ (১৭৩৫-১৮০৭) নীলমণি ঠাকুর, গোজলা গুঁই, নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১), নৃসিংহ রায় (১৭৩৮-১৮০৪), বলাই বৈষ্ণব, ভবানী বণিক, ভোলা ময়রা, এণ্টনী ফিরিঙ্গী (-১৮৩৭) ও হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪)।

পাঁচ

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ অবদান বিষ্ণুপুর ঘরানার উদ্ভব। এটা ধ্রুপদেরই একটা বিশেষ ঘরানা। এই ঘরানার বিশিষ্ট কলাবিৎ-দের মধ্যে ছিলেন গদাধর চক্রবর্তী, মাধব ভট্টাচার্য, কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, নিতাই নাজীর ও বৃন্দাবন নাজীর। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক এই ঘরানার সাংগীতিক খ্যাতি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাঙলাদেশে টপ্পা গানের গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত। যদিও তাঁকে বাঙলা দেশে টপ্পা গানের প্রবর্তক বলা হয়, তা হলেও সেটা ঠিক নয়। তাঁর পূর্বে কালী মির্জা বা কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ই টপ্পা গানের গায়ক ও রচয়িতা ছিলেন। তবে নিধুবাবুই এটাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁর রচিত টপ্পাতেই 'আধুনিক বাংলা কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক লৌকিক সুর প্রথম ধ্বনিত হয়।'

শ্যামাসঙ্গীতে হালিশহরের রামপ্রসাদ সেন ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি একাধারে শক্তিসাধক, কবি ও গায়ক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কলকাতায় মুহুরীর চাকরি করতেন। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। মহারাজ তাঁকে একশত বিঘা জমি দান করেন। তিনিও একখানা 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। তাঁর অপর রচনা 'কালীকীর্তন'। তাঁর কাব্য প্রতিভার জন্য তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ তাঁর রচিত সঙ্গীতের জন্য। তাঁর রচিত গান 'রামপ্রসাদী সঙ্গীত' নামে প্রসিদ্ধ ও তাঁর গীতি-ভঙ্গী 'রামপ্রসাদী সুর' নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী গান এক-সময় বাঙলার লোককে মাতিয়ে রেখেছিল।

নাগরিক সমাজের অভ্যুদয়

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা এসে যখন প্রথম কলকাতায় বসবাস শুরু করে, তখন জায়গাটার সম্পূর্ণ গ্রাম্যরূপ ছিল। সেজন্য যে সকল বাঙালী প্রথম কলকাতায় এসে বাস আরম্ভ করেছিল, তাদের পক্ষে এখানকার পরিবেশটা বেশ সহজ ছিল। তার মানে, যারা প্রথম গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিল, তারা গ্রামকেই এখানে তুলে নিয়ে এসেছিল। গ্রামীণ ধর্মকর্ম কলকাতায় অনুসরণ করা যাতে না বিঘ্নিত হয়, তার জন্য তারা সঙ্গে করে এনেছিল তাদের বামুন-পুরুত, নাপিত ইত্যাদি। সঙ্গে করে তারা আরও এনেছিল গ্রামের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা যথা পাঠশালা, চতুষ্পাঠী ইত্যাদি।

গ্রামীণ সমাজ যা শহরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা প্রথম আঘাত পায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে শহরে এক 'অভিজাত' শ্রেণীর অভ্যুত্থানে। শেঠ-বসাকরা যারা প্রথম এই শহরে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তারা ইংরেজরা আসবার বহুকাল পর পর্যন্ত গ্রামীণ সভ্যতার ধারক ছিল। শেঠ-বসাকরাই শহরে প্রথম কোঠাবাড়ী তৈরী করে। কলকাতার জমিদার সাবর্ণচৌধুরীদেরও লালদিঘির ধারে একটা কাছারিবাড়ী ছিল। তারপর ইংরেজরা আসবার পর আগন্তুকদের মধ্যে যারা দু পয়সা রোজগার করেছিল, তাদের মধ্যে দু-চারজন কোঠাবাড়ী তৈরী করতে থাকে। গোড়ার দিকে বাঙালীটোলা ছিল বড়বাজার থেকে হাটখোলার মধ্যে। একশ বছর পরে যখন মারবারীরা শহরে আসতে থাকে, তখন থেকেই বড়বাজার বাঙালীদের বাসকেন্দ্র হিসাবে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

গোড়ার দিকে যে সব বাঙালী জমকালো ধরণের বাড়ী তৈরী করতে চাইল, তাদের বড়বাজার-হাটখোলার বাইরে কুমারটুলিতে বাড়ী নির্মাণ করতে হল। এখানে খুব জমকালো ধরনের বাড়ী তৈরী করল বনমালী সরকার। তারপর গোবিন্দরাম মিত্রও কুমারটুলিতে একটা বড় বাড়ী ও তার সংলগ্ন এক সুউচ্চ নবরত্ন মন্দির তৈরী করলেন। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় গোকুল মিত্রও এসে কাছাকাছি এক বড় বাড়ী তৈরী করেন। এঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান সমাজের লোক ছিলেন। তার মানে, এরা সকলেই গ্রামীণ আচার-বিচার ও শাস্ত্রের

বিধান অনুযায়ী ধর্মকর্ম করতেন। কিন্তু শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পর যখন রাজা নবকৃষ্ণ দেব রাসপল্লীতে (পরেকার নাম শোভাবাজার) এসে বসতি স্থাপন করলেন, বাঙালীর সমাজজীবন এক নূতন রূপ ধারণ করল। হিন্দুর পালপার্বণে যেখানে ব্রাহ্মণ, আত্মীয় ও স্বজনবর্গ নিমন্ত্রিত হত, মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব সাহেবদের অনুগ্রহ লাভের জন্য তাদের সঙ্গে যোগ করে দিলেন সাহেব-মেমদের। পূজাবাড়ীতে তখন প্রবেশ করল বিদেশী সুরা ও নিষিদ্ধ খানা। সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রবেশ করল যবনী নর্তকীর দল। সাহেবদের অনুগ্রহলাভের জন্য আরও পাঁচজন বড়লোক নবকৃষ্ণকে অনুসরণ করল। শহরে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে যখন জমিদারীসমূহ নিলাম হতে লাগল, তখন এরাই কিনলেন সেসব জমিদারী। এদের বংশধররা রাত্রিতে নিজ বাড়ীতে থাকা আভিজাত্যের হানিকর মনে করল। রাত্রিটা রক্ষিতার গৃহেই কাটাতে লাগল। এদের জীবনযাত্রা প্রণালী গ্রামীণ সমাজ খুব কুটিলদৃষ্টিতে দেখল, যা উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়' ও অন্যান্য গ্রন্থে চিত্রিত করলেন। শহরের অভিজাত শ্রেণীর এই জীবনযাত্রা প্রণালী কিন্তু সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করল না। সাধারণ লোক নিষ্ঠাবান ও গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে রইল। এটা আমরা সমসাময়িক শিল্পীদের আঁকা ছবি থেকে জানতে পারি। এঁরা হচ্ছেন টমাস ড্যানিয়েল, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, সলভিনস্ ও উইলিয়াম সিমপসন। এই সব শিল্পী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সামনে সমসাময়িক সামাজিক জীবন, ধর্মীয় উৎসব ও রীতিনীতির প্রতিচ্ছবি।

দুই

অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় যে অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তারা পয়সা করেছিল দেওয়ানী, বেনিয়ানি ও ব্যবসাবাণিজ্যে। গোড়ার দিকে অবশ্য অনেকে ঠিকাদারী ও চাকুরী করেও পয়সা উপার্জন করেছিল। কলকাতার ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন কুশারী জাহাজে মাল ওঠানো-নামানোর ঠিকাদারী করতেন। তাঁর ছেলে জয়রাম কলকাতার কালেকটর বাউচারের অধীনে আমিনের চাকুরী করতেন। বনমালী সরকার ইংরেজদের ডেপুটি ট্রেডার ছিলেন। নন্দরাম সেন কালেকটরের সহকারী ছিলেন। গোবিন্দরাম মিত্রও

তাই। শেঠ-বসাকরা ব্যবসা করতেন। রতু সরকার ও শোভারাম বসাকও তাই। শোভারাম ইংরেজদের সঙ্গে সুতা ও বস্ত্রের কারবার করে কোটিপতি হয়েছিলেন। শতাব্দীর মধ্যাহ্নে গোকুল মিত্র মুনের একচেটিয়া ব্যবসা ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাতি ও ঘোড়ার রসদ সরবরাহ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় শুকদেব মল্লিক ও নয়নচাঁদ মল্লিক পয়সা করেছিলেন তেজারতি কারবার করে। সিঁদুরিয়াপটিতে নয়নচাঁদের সাতমহল বাড়ি ছিল। নয়নচাঁদের ছেলে নিমাইচাঁদ মুনের ও জমিজমার ফাটকা করে তিন কোটি টাকার মালিক হয়েছিলেন। চোরবাগানের রাজেন্দ্র মল্লিকের পিতামহ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থেকে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। অগাধ ধনের মালিক হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্যাতি ছিল গৌরী সেনের। সামান্য অবস্থা থেকে আমদানী রপ্তানীর কারবারে তিনি অসাধারণ ধনশালী হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নের পর খুব চাঞ্চল্যকরভাবে বড়লোক হয়েছিলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন মহারাজ রাজবল্লভ। হেস্টিংস-এর দৌলতে যাঁরা বড়লোক হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্তবাবু ও পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী মুদীর দোকানে কাজ করতেন বলে বাঙলার জনসমাজে কান্ত মুদী নামে পরিচিত ছিলেন। ফারসী ও যৎসামান্য ইংরেজি জানতেন, এবং সেজন্য ইংরেজ কুঠিতে মুহুরীর কাজ পেয়েছিলেন। সিরাজের ভয়ে ভীত ওয়ারেন হেস্টিংসকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন। হেস্টিংস যখন গভর্নর-জেনারেল হন, তখন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মুৎসুদ্দী হয়ে হেস্টিংস-এর সকল রকম দুষ্কার্যের সহায়ক হন। নন্দকুমারের ফাঁসি ও কাশীর রাজা চৈত সিং-এর ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনে কান্তবাবুই প্রধান ষড়যন্ত্রী ছিলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিছু অংশ পান। তা ছাড়া, হেস্টিংস-এর কৃপায় তিনি বহু জমিদারী ও ভূসম্পত্তি উপহার পান। অত্যন্ত চতুর ও ফন্দীবাজ লোক ছিলেন ও কাশিম-বাজার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থান্ধ বঙ্গসন্তান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙলার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে গেছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রাজস্ব আদায়কারী রেজা খাঁর অধীনে কানুনগোর কাজ করতেন। হেস্টিংস তাঁকে কলকাতা কাউনসিলের দেওয়ানের পদ দেন, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে সে পদ থেকে অপসৃত হন। পরে হেস্টিংস-এর কৃপায় পুনরায় বহাল হন। পাঁচশালা বন্দোবস্তের সময় রাণী ভবানীর জমিদারীর কিয়দংশ হস্তগত করেন ও পাইকপাড়ার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদার হিসাবে অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন।

কোম্পানির অধীনে চাকুরী করে আর যাঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভুকৈলাসের মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর বড়লোক ছিলেন বালাখানার চূড়ামণি দত্ত। ধনগরিমায় তিনি ছিলেন নবকৃষ্ণ দেবের প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেওয়ানী করে আর যাঁরা পয়সা উপার্জন করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন দেওয়ান হরি ঘোষ, শান্তিরাম সিংহ, রামহরি বিশ্বাস, রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণরাম বসু প্রমুখ।

বেনিয়ানী করে যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করেছিলেন বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়। বেনিয়ানগিরিতে বা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর যাঁরা প্রভূত ধনসম্পত্তি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র, বারাণসী ঘোষ, অক্রুর দত্ত, বিশ্বনাথ মতিলাল, হিদারাম ব্যানার্জি, মদনমোহন দত্ত, রামদুলাল দে সরকার, গঙ্গানারায়ণ সরকার, দুর্গাচরণ পিতুরী, রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়, সুখময় ঠাকুর, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, বৈষ্ণবচরণ শেঠ প্রমুখ।

তিন

১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের জালিয়াতি করার অপরাধে যে প্রাণদণ্ড হয় তা রদ করবার জন্য কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি গভর্নর-এর কাছে এক আবেদন করেছিলেন। এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষরকারীদের সংখ্যা থেকে বুঝতে পারা যায় যে কলকাতার নাগরিক সমাজে তখন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। এই স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন নবকৃষ্ণ দেব, হুজুরীমল, গোকুল ঘোষ, শুকদেব মল্লিক, রাসবিহারী শেঠ, নিমাইচরণ শেঠ, মদনমোহন দত্ত, শ্যামচাঁদ দত্ত, হরেকৃষ্ণ দত্ত, মানিক দত্ত, কন্দর্প ঘোষ, রামচাঁদ ঘোষ, শঙ্কর হালদার, পূর্ণানন্দ বসাক, শোভারাম বসাক, রাধামোহন বসাক,

দুর্গারাম সেন, নন্দরাম সেন, দয়ারাম শর্মা, জয়কৃষ্ণ শর্মা, উদয়রাম শর্মা, রাধাকান্ত শর্মা, রামনিধি শর্মা, রাধাচরণ মল্লিক, পীতাম্বর শেঠ, বিনোদবিহারী শেঠ, গুরুচরণ শেঠ, নীলাম্বর শেঠ, গোকুলকিশোর শেঠ, কুন্দ ঘোষাল, বাবুরাম পণ্ডিত, বনমালী ব্যানার্জী, রাধাকৃষ্ণ মল্লিক, দয়ারাম মুখোপাধ্যায়, মনোহর মুখোপাধ্যায়, তোতারাম বসু, রামশঙ্কর বসু, রামশঙ্কর দত্ত, দুর্গারাম দত্ত, চূড়ামণি দত্ত, কৃষ্ণচাঁদ দত্ত, রামনিধি ঠাকুর, বিশ্বনারায়ণ ঠাকুর, দয়ারাম ঠাকুর, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, শ্যাম চক্রবর্তী, কেবলরাম ঠাকুর, রামচরণ রায়, রূপরাম মিত্র, গোবর্ধন মিত্র, গণেশ বসু, গঙ্গারাম মিত্র, গোকুল মিত্র প্রমুখ। এছাড়া সমসাময়িককালে কাস্টমস্ হাউসে বাজেয়াপ্ত করা মালের নীলামে ক্রেতাদের মধ্যে আমরা দর্পনারায়ণ ঠাকুর, কেবলরাম নিয়োগী ও রাধাচরণ মিত্রেরও নাম পাই। অন্য সূত্র থেকে আমরা বনমালী সরকারের পুত্র রাধাকৃষ্ণ সরকার, নবকিশোর রায়, রামহরি রায়, রামসুন্দর মিত্র, নিমাইচরণ মিত্র, রামপ্রসাদ বকসী, সপ্তরাম ভঞ্জ, রামসুন্দর বসু, দয়ারাম চ্যাটার্জি, রামদুলাল দত্ত, গোকুল শিরোমণি প্রমুখদের নামও পাই।

সাহেবী সমাজ

সাহেবরাই কলকাতা শহরকে গড়ে তুলেছিল। সুতরাং গোড়া থেকেই এটা সাহেবদের শহর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ১২০০ ইংরেজ বাসিন্দা ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪০০০। কিন্তু তাদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৫০ জন। সুতরাং যে সমাজে পুরুষের তুলনায় মেয়েছেলে কম থাকে, সে সমাজে যা ঘটে, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। ইংরেজদের যৌন চরিত্রের মান খুব উচ্চস্তরের ছিল না। অধিকাংশ ইংরেজই তাদের যৌনক্ষুধা মেটাতো এদেশী মেয়েদের মাধ্যমে। সাহেবদের এরূপ এদেশী ঘরণীদের 'বিবিজান' বলা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাহেবরা যখন কলকাতায় বসবাস শুরু করে তখন তারা ছিল মিতব্যয়ী ও খুব সংযমী। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিশেষ করে পলাশী যুদ্ধের পর তারা হয়ে ওঠে অত্যন্ত বিলাসপরায়ণ। তখন কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে 'নবাব' হবার বাসনা জেগে ওঠে। তারা অবৈধ উপায়ে প্রচুর অর্থ উপায় করত। উৎকোচ গ্রহণ করা কোম্পানির উচ্চস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। যুগের হাওয়া অনুযায়ী কোম্পানির নিম্নস্তরের কর্মচারীরাও অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে এক একজন খুদে নবাব হয়ে উঠেছিল। সে যুগের পাদরী, ডাক্তার, অ্যাটর্নী প্রভৃতির দক্ষিণাও ছিল অসম্ভব। এ সব সাহেবদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল নানারকম দাসদাসী রাখা। এ ছাড়া, সাহেবদের ক্রীতদাস ছিল। অনেক সাহেবের আবার এদেশী ঘরণীও ছিল। (সাহেবদের এদেশী ঘরণী সম্বন্ধে লেখকের 'কলকাতার চালচিত্র', পৃষ্ঠা ১৪-১৯ দ্রষ্টব্য)।

সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল বলে সাহেবরা বেশ গাণ্ডেপিণ্ডে খেত। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে খাদ্যসামগ্রীর দাম ছিল—একটা গোটা ভেড়া দু'টাকা, একটা বাচ্চা ভেড়া এক টাকা, ছয়টা ভাল মুরগী বা হাঁস এক টাকা, এক পাউণ্ড মাখন আট আনা, ১২ পাউণ্ড রুটি এক টাকা, ১২ বোতল বিলাতী ক্লারেট মদ ৬০ টাকা ইত্যাদি। সাহেবরা দিনে তিনবার খেত। সকালে প্রাতরাশ। যার যা খুসী খেত, এবং পরিমাণের হিসাব থাকত না। তারপর দুটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন

(পরবর্তী কালে এটা একটার সময় খাওয়া হত, এবং এটাকে 'টিফিন' বলা হত)। মধ্যাহ্নভোজনে যত পারত খেত ঝলসানো ও কষা মাংসের পদ। তা ছাড়া মুরগী বা হাঁসের মাংস, নানারকম শাকসবজী, আলু ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল মদ্যপান করার ধুম। প্রতি মেয়েছেলে দিনে এক বোতল ও পুরুষরা চার বোতল মদ খেত, মধ্যাহ্নভোজনের পর সকলেই এক ঘুম ঘুমিয়ে নিত। সন্ধ্যা-বেলা ঘুম থেকে উঠে চা খাবার পালা পড়ত। তারপর ছিল সান্ধ্যভ্রমণ। বাড়ী ফিরে রাত দশটার সময় ছিল সান্ধ্যভোজনের পালা। এটাতেও রীতিমত চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় সবই থাকত।

যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন হয়েছিল, তা হলেও সাহেবরা পালকি চড়েই যাতায়াত করত। বস্তুতঃ কলকাতায় বসতি স্থাপনের পর সাহেব-মেয়েরা দু'টো জিনিষ রপ্ত করে নিয়েছিল। একটা পালকি চাপা ও আর একটা হুকোয় তামাক খাওয়া।

মেয়েছেলে নিয়ে সে যুগে সাহেবদের প্রায়ই লড়াই হত। একে 'ডুয়েল' বলা হত। শুধু মেয়েছেলে নয়, কোন বিবাদ-বিসম্বাদও ডুয়েলের মাধ্যমেই মীমাংসিত হত।

আবার কোন কোন সাহেব এদেশে থেকে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে হিন্দু স্টুয়ার্ট (মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট) প্রসিদ্ধ। তিনি প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে শালগ্রাম শিলার পূজা করাতেন। তাঁর বাড়ীতে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ছিল।

দুই

ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর এক বন্ধুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে তিনি কলকাতাকে এশিয়ার এক বিশিষ্ট শহরে পরিণত করতে চান। হয়ত সাহেবদের শহর হিসাবে তিনি কলকাতার মানকে অনেকটা উন্নত করেছিলেন, কিন্তু কলকাতার বেশীর ভাগ উন্নতি হয়েছিল তাঁর পরে। তাঁর আমলে যে সকল উন্নতি হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল শহরের ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা, ডাকের প্রবর্তন, স্থলপথে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানি স্থাপন, সওদাগরী অফিসের উদ্ভব, ক্রিকেট ও ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তন, ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন, থিয়েটার স্থাপন, সংবাদপত্রের প্রচলন, প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের

জন্য এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ও বাংলা হরফের সৃষ্টি। এর মধ্যে বাংলা হরফের সৃষ্টিই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের পথ সুগম করেছিল। বাংলা হরফের সৃষ্টি ও ছাপাখানার প্রসার সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করছি। আর অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য পাঠক আমার 'কলকাতা : পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস' বইখানা দেখে নিতে পারেন।

ছাপাখানা ও নবজাগৃতি

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আট বছর পরে বাঙলার ইতিহাসে এমন এক যুগ-প্রবর্তনকারী ঘটনা ঘটে, গুরুত্বে যার মত ঘটনা বাঙলাদেশে পূর্বে ঘটেনি, পরেও ঘটেনি। ঘটনাটার জের প্রথম উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, বাঙলার জনসমাজের সামনে জ্ঞানরাজ্যের ভাণ্ডার যার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় সংঘটিত হয়েছিল এক নবজাগরণ।

ঘটনাটা হচ্ছে একখানা বইয়ের প্রকাশ। বইখানা হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় রচিত ও হুগলীতে মুদ্রিত ন্যাথানিয়াল ব্রাশী হ্যালহেড কৃত বাংলা ভাষার একখানা ব্যাকরণ। বইখানার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই বইখানাতেই প্রথম বিচ্ছিন্ন নড়নশীল (movable types) বাংলা হরফের চেহারা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। এই হরফ তৈরী করেছিলেন চার্লস উইলকিনস নামে কোম্পানির এক সিভিলিয়ান। তিনি পঞ্চানন কর্মকার নামে এদেশের একজন দক্ষ ও প্রতিভাশালী শিল্পীকে হরফ তৈরীর প্রণালীটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলা হরফের সাট বিবর্তনের ইতিহাসে পঞ্চাননের ও তার পরিজনদের প্রয়াস ও দান অনন্যসাধারণ।

হ্যালহেডের 'গ্রামার' ছাপা হবার পর ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে জোনাথান ডানকান 'মপসল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম' নামক একখানা বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পরের বছর (১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে) বইখানি 'দেওয়ানী আদালতের বিচার পরিচালনার নিয়মাবলী' নামে বড় আকারে প্রকাশিত হয়। তখন বইখানি দ্বিভাষিক রূপ নেয়। বইখানির বামদিকের পৃষ্ঠায় ইংরেজি পাঠ ও ডানদিকের পৃষ্ঠায় তার বাংলা অনুবাদ ছাপা হয়। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দেও তিনখানা আইনের বই বাংলায় প্রকাশিত হয়। বইগুলি যথাক্রমে 'কালেকটরদের আচরণ বিধি', 'মপস্বল দেওয়ানী আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিচার ও ন্যায়ের কার্যের নিমিত্ত সন ১৭৮৭ ইং জুন ২৭ যে ধারা ও নিয়ম সাব্যস্ত হইল তাহা সকলের জ্ঞাত কারণ তর্জমা হইয়া নামতে লিখা যাইতেছে', ও 'ফৌজদারী আদালতের গোর্দ্দধারী ,কারণ জেলাদার সাহেবদিগের নামে যে

হুকুমনামা সন ১৭৮৭ ইংরেজি তারিখ ২৭ জুন শ্রীযুক্ত প্রবলপ্রতাপ গভর্নর-জেনারেল বাহাদুর আজ্ঞা করিয়াছেন তার তর্জমা।'

১৭৯১ ও ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে নীল বেঞ্জামিন এডমণ্ডস্টোন সাহেব ছাপালেন বই আকারে 'ফৌজদারী আদালতের নিয়মাবলী' ও 'ম্যাজিস্ট্রেট-কার্যবিধি' নামে আরও দুটি আইনের তর্জমা। এগুলিই হচ্ছে বাংলা গদ্যের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচিত হত পদ্যে। এই প্রথম মুদ্রিত গদ্যসাহিত্যের প্রবর্তন হল। যার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল বই ও সংবাদপত্র, যা পরবর্তী শতাব্দীতে সহমরণ নিবর্তন, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কারমূলক আন্দোলনের কাজে সাহায্য করেছিল।

ছাপা বই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিল শিক্ষার প্রসারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলকাতা শহর মুদ্রণের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পূর্বে লোকের বিদ্যাবুদ্ধি যা কিছু হাতে লেখা পুঁথির মধ্যে ও বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যার প্রসার যে এক অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সমাজের ওপর ছাপাখানার প্রভাব পড়েছিল এখানেই। ছাপাখানা মুদ্রিত বইয়ের সাহায্যে জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষাকে সার্বজনীন বা democratized করে তুলেছিল। শিক্ষাবিস্তারের ফলে লোক যখন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করল, তখন তারা পাশ্চাত্যদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হল। এই পরিচিতিই তাদের সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নূতন নূতন দিগন্তের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। এই নূতন নূতন দিগন্তের ওপরই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। মানুষের মন নূতন আলোকের সন্ধান পেল। মানুষ যুক্তিনিষ্ঠ হল। সেই যুক্তিনিষ্ঠতাই সমাজ সংস্কারকদের অনুপ্রাণিত করল সামাজিক অপপ্রথা সমূহ দূর করতে। সেজন্যই সনাতনীদের ছাপাখানার ওপর এক প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। কিন্তু ছাপাখানা থেকে যখন হুড়হুড় করে বই ও সংবাদপত্র বেরুতে লাগল ও দেশের জনসাধারণ তা কিনে পড়তে লাগল, তখন তার স্রোতে ছাপা-বই বিদ্রোহী সনাতনীরাই ভেসে গেল। বস্তুতঃ ছাপা বই না থাকলে, এদেশে শিক্ষার প্রসার সুগম হত না, ও নবজাগৃতিরও আগমন ঘটত না।

এ সম্পর্কে আমাদের আরও স্মরণ করতে হবে যে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির যাঁরা প্রধান হোতা ছিলেন যেমন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রামমোহন

রায়, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীরই লোক ছিলেন, যদিও নবজাগরণের উদ্বোধনে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন এদেশে ইংরেজি শিক্ষার পথিকৃৎ। ইংরেজ মহলে তাঁর ছিল অসাধারণ প্রভাব। তিনিই ইংরেজদের কাছে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন, এবং ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ওই কলেজের প্রথম সম্পাদক হন। রামমোহন রায় ছিলেন নবজাগৃতির জনক। তিনিই দেশের লোকের মনে প্রথম যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধারার সঞ্চার করেন। শিক্ষার প্রসারে সহায়ক ছিল স্কুল বুক সোসাইটি। এর পত্তনের সময় থেকেই রাধাকান্ত দেব ছিলেন এর ভারতীয় সম্পাদক। বাংলা ভাষার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প বিষয়ক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি সরকারের গোচরীভূত করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল। 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক মহাকোষ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

বাংলা গদ্য সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির সার্থক রূপায়ণে সাহায্য করেছিল বাংলা গদ্য ভাষা। এর সূচনা আঠারো শতকেই হয়েছিল। লোক গদ্যেই কথা বলত। তা ছাড়া দলিলাদি সম্পাদন ও অন্যান্য বৈষয়িক কাজকর্মে গদ্যই ব্যবহৃত হত। চিঠিপত্রও গদ্যে রচিত হত। ১৭৭১ ও ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে লিখিত মহারাজ নন্দকুমারের দুখানা সুদীর্ঘ চিঠি পাওয়া গিয়েছে। পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর সম্পাদিত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' নামক পুস্তকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক চিঠির নমুনা দিয়েছেন। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের একখানা দানপত্রও পাওয়া গিয়েছে। সাহিত্যও গদ্যে রচিত হত। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে লিখিত এক পুঁথি থেকে দীনেশচন্দ্র সেন এক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদ্ধৃতিটি—'পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্য মন্ত্র কহিয়া পরে সেই চৈতন্য মন্ত্রের অর্থ জানাইয়া পরে সেই জীব দ্বারা-এ দশ ইন্দ্রিয় আদিযুক্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রীকৃষ্ণাদির রূপ আরোপ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে সিদ্ধি অভিমান শ্রীকৃষ্ণাদির মুক্তি পৃথক দেখাইয়া প্রেম লক্ষণার সমাধি ভক্তিতে সংস্থাপন করিলেন।' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত 'স্মৃতিকল্পদ্রুম' নামে এক বাংলা গদ্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা গদ্যগ্রন্থের মধ্যে কুচবিহারের রাজমুনশী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান', 'ভাষা পরিচ্ছেদ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা গদ্য অনুবাদ ও 'বৃন্দাবনলীলা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। 'বৃন্দাবনলীলা'র গদ্যের নিদর্শন —'কৃষ্ণ যে দিবস ধেনু লইয়া এই পর্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন।'

এছাড়া, খ্রীস্টান মিশনারীরাও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা গদ্যে ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে গিয়েছেন। তবে এগুলো সব রোমান হরফে ছাপা। এরূপ গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে দম আন্তোনিও (ভূষণার এক ধর্মান্তরিত হিন্দু) রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'। নীচে এই বইয়ের গদ্য ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে—'রামের এক স্ত্রী তাহার নাম সীতা আর

দুই পুত্রো লব আর কুশ তাহার ভাই লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সত্য পালিতে বোনবাসী হইয়াছিলেন। তাহাতে তাহান স্ত্রীকে রাবোনে ধরিয়া লিয়াছিলেন। তাহান নাম সীতা। সেই স্ত্রীরে লঙ্কাত থাক্যা বিস্তর যুর্দো করিলেন।' আর একখানি মিশনারী গ্রন্থ মানোএল-দা-আস্সুম্পসাঁম নামে এক পর্তুগীজ পাদ্রী কর্তৃক ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালে বসে রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এর ভাষার নিদর্শন—'আমার কেহ নাহি, কেবল তুমি আমার এবং আমি তোমার ; আমি তোমার দাসী ; তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা। তোমার আশ্রয়ে বিস্তর পাপী অধমে, যেমত আমি, উপায় পাইল। তবে এত অধমেরে যদি উপায় দিবা, আমারেও উপায় দিবা।'

বাংলা গদ্যসাহিত্যের এখানে যে উল্লেখ করা হল, তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্য লেখবার একটা রীতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, যদিও এটা বিশেষভাবে উৎকর্ষতা লাভ করেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন রায় ও অন্যান্য অনেকের রচনাতে। আগেই বলেছি যে এই গদ্যসাহিত্যই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির সার্থক রূপায়ণে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরিশিষ্ট 'ক'

নন্দকুমারের বিচার ও ফাঁসি

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখ কলকাতার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। ওই দিন ইংরেজগণ কর্তৃক কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রহ্মহত্যা। হিন্দুর দৃষ্টিতে ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। পাছে ব্রহ্মহত্যার পাপ তাদের স্পর্শ করে, সেজন্য ৫ আগস্ট তারিখে প্রত্যুষেই কলকাতার লোকেরা শহর ছেড়ে গঙ্গার অপর পারে চলে গিয়েছিল।

যাকে নিয়ে এই ব্রহ্মহত্যা ঘটেছিল, তিনি হচ্ছেন মহারাজ নন্দকুমার রায়। আগেই বলেছি (পৃ. ৭৩) যে ওয়ারেন হেস্টিংস ষড়্যন্ত্র করে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ব্যাপারটা বিশদভাবে অনেকেরই জানা নেই। সেটাই এখানে বলছি।

নন্দকুমারের পৈতৃক বাসস্থান ছিল বীরভূম জেলার ভদ্রপুর গ্রামে। পিতার নাম পদ্মনাভ রায়। তিনি ছিলেন মুরশিদকুলি খাঁর আমিন। নন্দকুমার ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা ও পিতার রাজস্ব-সংক্রান্ত কাজ শিখে আলিবর্দী খাঁর আমলে প্রথমে হিজলি ও মহিষাদল পরগনার রাজস্ব আদায়ের আমিন ও পরে হুগলীর ফৌজদারের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। পলাশী যুদ্ধের পর নন্দকুমার নানা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় বর্ধমানের খাজনা আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধের সূত্রপাত হয়। হেস্টিংস তখন কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন।

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে পরে নন্দকুমার কলকাতায় আসেন। কলকাতায় তিনি একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ান। তিনি প্রতিভাশালী ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর নানা রকম গুণে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহ্ শাহ আলম তাঁকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। দেশের লোককে রেজা খাঁর অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দেশের লোকেরও তিনি প্রিয় হয়েছিলেন। তিনি কোনরূপ অত্যাচার সহ্য করতে পারতেন না, এবং সব সময় অত্যাচারিতের পক্ষ নিয়ে দণ্ডধারণ করতেন। তা ছাড়া, বীডন স্কোয়ারের নিকট তাঁর বাড়ির দ্বার সব সময়েই দরিদ্র দেশবাসীর জন্য উন্মুক্ত থাকত। প্রত্যহ এক বিরাট জনতা তাঁর

বাড়িতে ভোজন করত।

এহেন নন্দকুমারের মত ব্যক্তির বিচার পৃথিবীর নবম আশ্চর্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। হেস্টিংস ও তাঁর কাউনসিলের সঙ্গে নন্দকুমারের বনিবনা ছিল না। তিনি হেস্টিংস-এর রোহিলা যুদ্ধ ও ফৈজাবাদের সন্ধির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। হেস্টিংস-এর সঙ্গে তাঁর বিরোধ চরমে ওঠে যখন ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের রাণী অভিযোগ করেন যে হেস্টিংস তাঁর কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছেন। ওই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দেই নন্দকুমার অভিযোগ করেন যে, হেস্টিংস মুনি বেগমের কাছ থেকে ৩,৫৪,১০৫ টাকা ঘুষ নিয়ে তাঁকে নাবালক নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত করেছেন। হেস্টিংস প্রত্যভিযোগ আনেন যে, নন্দকুমার কামালউদ্দিন নামে (কামালউদ্দিন হেস্টিংস-এরই আশ্রিত লোক) এক ব্যক্তিকে প্ররোচিত করেছেন হেস্টিংস-এর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনবার জন্য। নন্দকুমার এ মামলায় সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হন। তখন হেস্টিংস কামালউদ্দিন ও মোহন-প্রসাদ নামক আর এক ব্যক্তি দ্বারা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক জালিয়াতির মামলা আনেন। এই মামলাতেই নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

মামলার বিষয়বস্তু ছিল একগাছা মোতির মালা ও কয়েকটি অন্যান্য অলঙ্কার। ১১৬৫ বঙ্গাব্দের (ইংরেজি ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের) আষাঢ় মাসে মহারাজ নন্দকুমার এই মোতির হার ও অলঙ্কারগুলি মুরশিদাবাদে বলাকীদাস নামে এক ব্যক্তির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন বিক্রয়ের জন্য। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের সময় মুরশিদাবাদে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, সে সময় বলাকীদাসের বাড়ি থেকে এগুলি লুণ্ঠিত হয়। ১১৭২ বঙ্গাব্দে (১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে) বলাকীদাস যখন কলকাতায় আসেন, নন্দকুমার তখন এগুলি তাঁর কাছ থেকে ফেরত চান। বলাকীদাস এগুলি ফেরত দিতে অসমর্থ হয়ে, নন্দকুমারের আনুকূল্যে একখানা দলিল তৈরী করে দেন। বলাকীদাস ওই দলিলে লিখে দেন যে, কোম্পানির ঢাকায় অবস্থিত খাজাঞ্চিখানায় তাঁর যে রোক টাকা আছে, তা ফেরত পেলে তিনি নন্দকুমারের ওই মোতির হার প্রভৃতির মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ সিক্কা টাকা মূল্য হিসাবে এবং তার ওপর টাকায় চার আনা হিসাবে অতিরিক্ত ব্যাজ দেবে। এই দলিল সম্পাদনের চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে বলাকীদাসের মৃত্যু ঘটে। বলাকীদাস তাঁর মৃত্যুশয্যায় নন্দকুমারকে ডেকে বলেন—'আমি আমার স্ত্রী ও কন্যার ভার আপনার ওপর সমর্পণ করে

যাচ্ছি। আমি আশা করি এতদিন আপনি আমার প্রতি যেরূপ আচরণ করেছেন, আমার স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গেও সেরূপ আচরণ করবেন।' এর কিছুদিন পরে যখন বলাকীদাসের বিষয়সম্পত্তি ও দেনাপাওনার নিষ্পত্তি হয়, তখন নিষ্পত্তিকারীরা নন্দকুমারের প্রাপ্য টাকা তাঁকে দিয়ে দেন। তখন বলাকীদাসের উক্ত দলিল বাতিল করা অবস্থায় কলকাতার মেয়র আদালতের ফেজখানায় জমা পড়ে এবং সেখানা সেখানেই থেকে যায়।

হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য, মেয়র আদালতের ফেজখানা থেকে ওই দলিলটা উদ্ধার করেন এবং ওরই ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে বলেন যে দলিলখানা জাল।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ মে তারিখে কলকাতাবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে গেল যখন তারা শুনল যে নন্দকুমারের ন্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা আনা হয়েছে, এবং তাঁকে সাধারণ কয়েদীদের রাখার জন্য নির্দিষ্ট জেলখানায় রাখা হয়েছে। সরকারের কাছে আরজি পেশ করা হল যে, নন্দকুমারের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে সাধারণ জেলখানায় রাখলে তাঁর ধর্ম নষ্ট হবে। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। হেস্টিংস-এর প্ররোচনায় বিচারকরা সকলে একমত হয়ে রায় দিলেন যে 'শেরিফ যেন নন্দকুমারকে সাধারণ জেলখানাতেই রাখে।'

৮ মে তারিখে নন্দকুমার প্রধান বিচারপতির কাছে এক আবেদন পত্রে বলেন যে, 'তাঁকে যদি সাধারণ জেলখানায় রাখা হয়, তা হলে তাঁকে জাতিচ্যুত হবার আশঙ্কায় আহার-স্নান প্রভৃতি পরিহার করতে হবে। সেজন্য তাঁকে এমন কোন বাড়িতে বন্দী করে রাখা হোক যা কোনদিন ক্রীশ্চান বা মুসলমান কর্তৃক কলুষিত হয়নি, এবং তাঁকে প্রতিদিন একবার করে গঙ্গায় স্নান করতে যেতে দেওয়া হোক।' কিন্তু বিচারকরা আবার একবাক্যে বললেন—'কয়েদীর এরকম আবদার কখনই মেনে নেওয়া যেতে পারে না।'

নন্দকুমার গোড়া থেকেই জেলখানায় আহার ত্যাগ করেছিলেন। সেজন্য ১০মে তারিখে প্রধান বিচারপতি ইমপে (হেস্টিংস-এর প্রাণের বন্ধু) নন্দকুমারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবার জন্য একজন চিকিৎসককে পাঠিয়ে দেন। চিকিৎসক মন্তব্য করেন, 'অনশন হেতু নন্দকুমারের এরূপ শারীরিক অবনতি ঘটেছে যে পরদিন প্রাতের পূর্বেই নন্দকুমারকে খাওয়ানো দরকার।' সেজন্য বিচারকরা অনুমতি দিলেন যে, প্রতিদিন প্রাতে একবার করে তাঁকে যেন জেলখানার

বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু নন্দকুমার সে অনুমতি প্রত্যাখ্যান করেন। সেজন্য জেলখানার প্রাঙ্গণে একটা তাঁবু খাটিয়ে সেখানে নন্দকুমারের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। নন্দকুমার সেখানে মিষ্টান্ন ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতেন না।

বর্তমান রাইটার্স-বিল্ডিংস-এর পূবদিকে এখন যেখানে সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জা অবস্থিত, সেখানেই তখন সুপ্রীম কোর্ট ছিল। এখানেই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৮ জুন তারিখে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত মামলার বিচার শুরু হয়। যে বিচারকমণ্ডলী নন্দকুমারের বিচার করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমপে, হাইড, চ্যাম্বারস্ ও লেমেস্টার। সরকারী পক্ষের উকিল ছিলেন ডারহাম, আর নন্দকুমারের পক্ষে ফারার। এই মামলায় দশজন ইওরোপীয় ও দুজন ইওরেশিয়ান জুরি নিযুক্ত হয়। দোভাষী ছিলেন হেস্টিংস ও ইমপে-র বন্ধু আলেকজাণ্ডার ইলিয়ট। তাঁর নাম প্রস্তাবিত হওয়া মাত্রই, ফারার আপত্তি তুলে বলেন যে, তাঁর মক্কেল একে শত্রুপক্ষের লোক বলে মনে করেন। কিন্তু ফারারের এ আপত্তি নাকচ হয়ে যায়। তারপর ফারার বলেন যে, তাঁর মক্কেলকে কাঠগড়ায় না পুরে যেন তাঁর উকিলের কাছে বসতে দেওয়া হয়, এবং তাকে যেন হাতজোড় করে দাঁড়ানো থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু আদালত ফারারের এসব আবেদনও নাকচ করে দেয়।

তারপর আইনের লড়াই চলে। বিচারক চ্যাম্বারস্ মত প্রকাশ করেন যে বিলাতের আইন কলকাতায় চলতে পারে না। সুতরাং এ মামলা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের এলাকার বাইরে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি (ইমপে) ও অন্য বিচারকরা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেন। সুতরাং মামলা চলতে থাকে।

নন্দকুমারকে তখন সওয়াল করতে বলা হয়। নন্দকুমার আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে "নির্দোষ" বলে ঘোষণা করেন। তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কার দ্বারা আপনি আপনার বিচার হওয়া উচিত মনে করেন ?' নন্দকুমার উত্তর দেন —'ঈশ্বর ও তার সমতুল্য ব্যক্তি দ্বারা।' বিচারকরা নন্দকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন—'কাকে আপনি সমতুল্য মনে করেন ?' ফারার উত্তরে বলেন—'এটা তিনি আদালতের বিবেকের ওপর ছেড়ে দিতে চান।'

সমস্ত বিচারটাই হল একটা প্রহসন মাত্র। মীর আসাদ আলি, শেখ ইয়ার মহম্মদ ও কৃষ্ণজীবন দাস প্রভৃতি অনেকে নন্দকুমারের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন যে, তাঁরা স্বচক্ষে বলাকীদাসের ওই দলিল সম্পাদন হতে দেখেছেন। কিন্তু তা

সত্ত্বেও ১৮ জুন তারিখে আদালত জুরিদের প্রতি তাঁদের অভিমত প্রকাশ করতে বলে। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেন—'নন্দকুমার দোষী, এবং তাঁর প্রতি কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করবার সুপারিশ আমরা করতে পারি না।' আদালত নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয় (তখনকার বিলাতী আইন অনুযায়ী জালিয়াতি অপরাধে প্রাণদণ্ড হত)। শুধু তাই নয়। নন্দকুমারের সমর্থনে যারা সাক্ষী দিয়েছিল, তাদের অভিযুক্ত করবারও আদেশ দেয়।

কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে নন্দকুমারকে বাঁচাবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল। কেননা, বিলাতে রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদনে জুরিদের অনুমোদন থাকা চাই। জুরিরা সে অনুমোদন দেননি।

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ আগস্ট তারিখে খিদিরপুরের কাছে কুলিবাজারের ফাঁসিমঞ্চে নন্দকুমারকে তোলা হল। অত্যন্ত প্রশান্ত মুখে ইষ্টদেবতার নাম করতে করতে নন্দকুমার ফাঁসিমঞ্চে ওঠেন। ইংরেজ-বিচারের যূপকাষ্ঠে বলি হলেন বাঙলার একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সব শেষ হয়ে গেলে গঙ্গার অপর পারে সমবেত হিন্দু নরনারী 'বাপরে বাপ' বলে চীৎকার করতে করতে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের পাপক্ষালনের জন্য।

পরিশিষ্ট 'খ'

বাঙলার শাসকগণ

মুঘল সুবেদারগণ

১। আজিম-উস-শান (১৬৯৮-১৭০৭)
২। ফারুকশিয়ার (১৭০৭-১৭১২)

মুরশিদাবাদের নবাবগণ

১। মুরশিদকুলি খান (১৭১৩-১৭২৭)
২। সরফরজ খান (১৭২৭)
৩। শুজাউদ্দিন (১৭২৭-১৭৩৯)
৪। সরফরজ খান দ্বিতীয় বার (১৭৩৯-১৭৪০)
৫। আলিবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬)
৬। সিরাজদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭) (বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব)
৭। মীরজাফর (১৭৫৭-১৭৬০)
৮। মীরকাশিম (১৭৬০-১৭৬৩)
৯। মীরজাফর দ্বিতীয় বার (১৭৬৩-১৭৬৫)
১০। নজম-উদ-দ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬)
১১। সইফ-উদ-দ্দৌলা (১৭৬৬-১৭৭০)
১২। মুবারক-উদ-দ্দৌলা (১৭৭০-১৭৯৩)
১৩। নাজির-উল-মুলক (১৭৯৩-১৮১০)
১৪। জিন্নুদ্দিন আলি খান (১৮১০) (পেনসন দান)

ইংরেজ শাসকগণ

১। ক্লাইভ (১৭৫৭-১৭৬০)
২। হলওয়েল (১৭৬০-১৭৬৫)
৩। ক্লাইভ দ্বিতীয় বার (১৭৬৫-১৭৬৭)
৪। ভেরেলস্ট (১৭৬৭-)
৫। কার্টিয়ার (-১৭৭২)
৬। ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২)

গভর্নর জেনারেলগণ

১। ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭৩-১৭৮৫)
২। স্যার জন ম্যাকফারসন (১৭৮৫-১৭৮৬)
৩। লর্ড কর্নওয়ালিশ (১৭৮৬-১৭৯৩)
৪। স্যার জন শোর (১৭৯৩-১৭৯৮)
৫। লর্ড ওয়েলেসলী (১৭৯৮-১৮০৫)

পরিশিষ্ট 'গ'

সংযোজন

১। **অন্ধকূপ হত্যা**—অন্ধকূপ হত্যা ইতিহাসের এক বিতর্কিত ব্যাপার। সেজন্য বইয়ের মধ্যে এর উল্লেখ বর্জ্জিত হয়েছে। এই বিতর্কের সূত্রপাত করেছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র ও অক্ষয়কুমার মৈত্র। জে. লিটল সাহেবও এটাকে অলীক ঘটনা বলে অভিহিত করেছিলেন। এঁরা সকলেই বলেছিলেন যে এটা হলওয়েল সাহেবের (যিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন) স্বকপোলকল্পিত। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ওটেন সাহেব এঁদের বিরোধিতা করেন। এ সম্পর্কে উল্লেখনীয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখক ইউসুফ আলি তাঁর 'তারীখ-ই-বাংলা-মহব্বত জঙ্গী' গ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ করে বলেছেন যে 'ঘটনাটি সত্যই ঘটেছিল'।

২। **পলাশীর যুদ্ধ**—পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে সিরাজ যখন জানতে পারেন যে মীরজাফর চক্রান্ত করে ইংরেজদের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি করেছে, তখন তিনি ভীত হয়ে মীরজাফরের বাড়ি ছুটে যান, ও অনুনয়-বিনয় করে তাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করান যে সে ইংরেজদের কোনরূপ সাহায্য করবে না। ক্লাইভ যখন এ খবর পান তখন তিনি ভাবেন যে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি মীরজাফরকে লিখে পাঠান। উত্তরে মীরজাফর বলে যে নবাবের কাছে তার প্রতিশ্রুতি কপট, এবং ইংরেজদের সঙ্গে তার যে চুক্তি হয়েছে, তা সে রক্ষা করবে। মুরশিদাবাদের পথে ইংরেজরা প্রথম পাটুলি গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। তারপর কাটোয়া দুর্গ অধিকার করে। এখানে ইংরেজরা গড়িমসি করতে থাকে, এখনই আক্রমণ করবে, কি বর্ষার জন্য অপেক্ষা করবে। শেষে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করাই সিদ্ধান্ত করে। এদিকে নবাবের বাহিনী তখন মুরশিদাবাদের ছয় মাইল দক্ষিণে মানকরে এসে পৌঁছেছে। ক্লাইভ যখন পলাশী গ্রামে গিয়ে পৌঁছায়, নবাববাহিনী তখন আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। নবাববাহিনী মীরমদন ও মোহনলাল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল। দু'পক্ষই কামান থেকে ভীষণ গোলাবর্ষণ করতে থাকে।

মীরজাফর ক্লাইভকে সংবাদ পাঠায় যে যুদ্ধে যখন মীরমদন ও মোহনলালের পতন ঘটবে, তখন সে ক্লাইভের সঙ্গে যোগ দেবে। অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মধ্যাহ্নকালে কামানের গোলার আঘাতে মীরমদন নিহত হয়। সিরাজ আর একবার মীরজাফরের হাতেপায়ে ধরে যুদ্ধে তাঁর মানরক্ষা করবার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানায়। মীরজাফর পরদিন প্রভাতে শত্রুকে প্রতিহত করবার প্রতিশ্রুতি দেয়, এবং মোহনলালকে তার শিবিরে ফিরে যেতে বলে। এর পরই মীরজাফর গোপনে ক্লাইভকে সব সংবাদ পাঠিয়ে, তাকে রাত্রিকালে মোহনলালের শিবির আক্রমণ করতে বলে। এদিকে মোহনলাল তার গোলন্দাজবাহিনীসহ শিবিরে প্রত্যাগমন করছে দেখে নবাববাহিনী ভাবে যে সমস্ত সৈন্যবাহিনীরই প্রত্যাগমনের আদেশ হয়েছে। নবাববাহিনীর মধ্যে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার উদ্ভব হয় ও সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে বিনাযুদ্ধে ক্লাইভ পলাশীতে বিজয়ী হয়।

৩। **কালীচরণ ঘোষ**—মীরজাফরের বিপরীত চরিত্র প্রদর্শন করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বাঙালী। নাম তাঁর কালীচরণ ঘোষ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জঙ্গীবিভাগে করণিকের কাজ করতেন। তৃতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধে ভরতপুর অবরোধের সময় ইংরেজবাহিনীর সেনাপতি নিহত হলে, তিনি মৃত সেনাপতির পোশাক পরে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইংরেজবাহিনীকে বিজয়ী করেছিলেন। বিনা অনুমতিতে সেনাপতির পোশাক ব্যবহারের জন্য সামরিক আইন অনুযায়ী তাঁর জরিমানা হয়। কিন্তু তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিতা ও বীরত্বের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। ঘটনাটা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ঘটলেও, কালীচরণ আঠারো শতকেই জঙ্গীবিভাগে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

৪। **এজেন্সী হাউস**—কোম্পানির কর্মচারীরা গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে প্রভুত অর্থ উপার্জন করত। গোপন ব্যবসায় যখন নিষিদ্ধ হল ও এরূপে উপার্জিত অর্থ যখন দেশে পাঠানো মুস্কিল হল, তখন তারা এজেন্সী হাউস খুলে সেই টাকা এখানেই ব্যবসায়ে বিনিযুক্ত করল। নীল ও চিনি উৎপাদন ও মাদ্রাজে চাউল ও চীনে অহিফেন রপ্তানীতেই টাকাটা খাটাতে লাগল। আবার কোম্পানির টাকার অনাটন হলে, কোম্পানিকেও তারা টাকা ধার দিত। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় ১৫টি এজেন্সী হাউস ছিল।

পরবর্তীকালে এজেন্সী হাউসগুলি ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্মের রূপ ধারণ করেছিল। সেকালে এজেন্সী হাউসগুলি সওদাগরী অফিস নামে অভিহিত হত।

৫। **ডাকাতি দমন**—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পদাঙ্কে সংঘঠিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সুন্দরবন অঞ্চলেও ডাকাতির খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ডাকাতরা ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদের নৌকা প্রায়ই লুট করত। এই ডাকাতদলের নেতা ছিল মহম্মদ হায়াৎ। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা মহম্মদ হায়াৎ সমেত এই দলটিকে গ্রেপ্তার করে। মহম্মদ হায়াৎ-এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাকে প্রিন্স অভ্ ওয়েলস দ্বীপে বন্দী করে রাখা হয়।

নির্ঘণ্ট